উল্টো দূরবীনে

একটি চতুর্মাসিক চড়ুইপত্র
১২ তম সংখ্যা / শরৎ ২০১৪

নিকোলা ভাপৎসারভ সংখ্যা

পুনর্মুদ্রণ

সরোজ দত্ত

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

অনুবাদ ও আলোচনা

গিয়োর্গি গসপডিনভ

শম্ভু ভট্টাচার্য

সব্যসাচী দেব

স্বপন চক্রবর্তী

বিশ্বনাথ গরাই

অশোক চট্টোপাধ্যায়

অনিন্দ্য চাকী

অবনীভূষণ কাঞ্জিলাল

জ্যোতির্ময় ঘোষ

জিৎ পাল

চন্দন ঘোষ

অমিত চক্রবর্তী

স্বপন হালদার

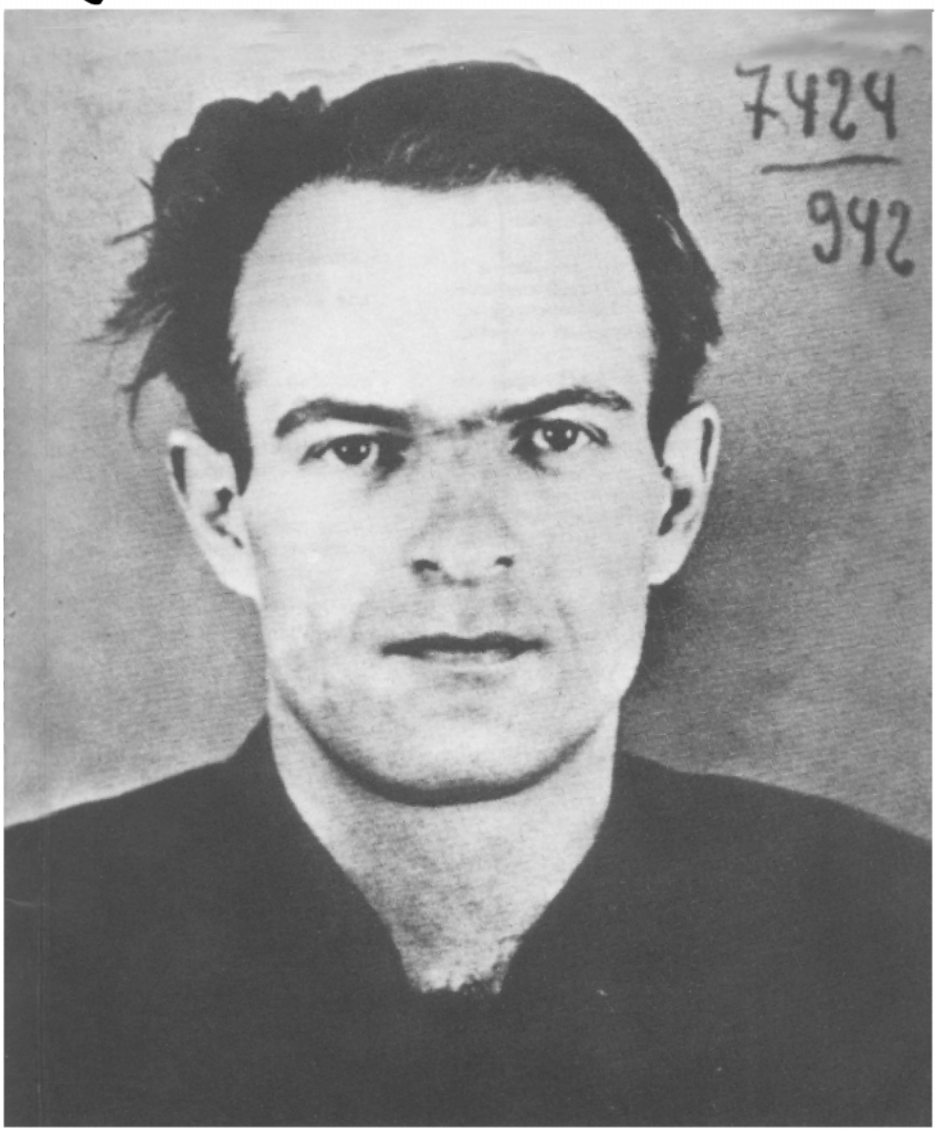

অবাধ্য ক্রিয়াপদগুলি

এই মার্চে ছেলের বান্ধবী স্বেতানা পেসোভা তার মাকে নিয়ে বুলগেরিয়া থেকে ভারত-এ আসে, তাজমহল আর টাইগার হিল দেখবে বলে। নেটেই বুক করেছিল, দার্জিলিংয়ের ডেকলিং হোটেল। ছেলে মাকে বলল : আমরাও তো যাইনি চলো ঘুরে আসি। ঐ একই হোটেলে আমাদেরও ব্যবস্থা হল।

নির্ধারিত দিনে কলকাতা থেকে কাঞ্চনকন্যায় শিলিগুড়ি নেমে দার্জিলিং পৌঁছে হোটেলে অপেক্ষা করছিলাম। ওরা দিল্লী হয়ে বাগডোগরা থেকে যখন পৌঁছল তখন ফিকে রোদ্দুর। বৌ বলল : ছেলে তো আলাপ করিয়ে দেবে, কি দেব ওদের হাতে? বললাম, ঐ তো টেবিলে রয়েছে; আপেল দুটোই দিও। কাছে এসে হাতে হাত রেখে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং আপেলেই খুশী; যথেষ্ট উজ্জ্বল। স্বেতানা আমার বৌকে একটা সুইসকার্ড লাইট, ছোট ছেলেকে চকলেট আর পেন্টিং বক্স, আমিও বাদ যাইনি পেলাম বুলগেরিয়ার লোক সংগীতের একটা সিডি সেই সাথে বুলগেরিয়ান কবি নিকোলা ভাপৎসারভের কবিতা সংগ্রহের ইংরাজী অনুবাদ। মনে মনে ভেবেছিলাম হাল আমলের মেয়ে ট্যাসমার্কাই হবে। কিন্তু ওর এই অনুভূতিপ্রবণ মন দেখে অবাক হলাম। পড়ে দেখব বলে যত্ন করে নিজের ব্যাগে রেখে দিলাম।

প্রথম দিন রোপওয়ে, চা বাগান, মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট; রাত্রে আহার সাংগ্রিলায়। পরদিন টাইগার হিলে কাঞ্চনজঙ্ঘায় অনুপম প্রতিফলন সূর্যোদয়ের। ক্ষণে ক্ষণে রঙের বদল দ্বিতীয়টি নেই ভুবনে, তাই তো আসে ওরা নানা দেশ থেকে। স্বেতানার মতো আরো অনেক বিদেশী পর্যটক-রাও তাদের ক্যামেরায় মুহূর্তটাকে ধরে রাখতে ব্যস্ত। আমরা জানি 'মহান তার চূড়া ব্যাপ্ত করে নভে শুভ্র কুমুদের কান্তি'-কালিদাসের 'মেঘদূত'-কবি বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে। বন্ধু কবি শম্ভু ভট্টাচার্যের সাথে বেশ কয়েকবার ট্রেক করেছি হিমালয়ে। ওর 'সতোপন্থ সরোবর' কবিতাটার কথা মনে পড়ছে :

ছান্দোগ্য-ঋষি জানেন এই সেই অমৃত যা
দেবতাগণ চক্ষু দ্বারা পান করেন
হিমালয়। ....
এ কী অপরূপ : পৃথিবীর বুকে এ এক অন্য পৃথিবী।

হয়তো বা ব্রহ্মলোক ও মর্ত্যলোকের মাঝে এই সেই মেরু, দেবলোক ফুলের দেশের মেয়ে, ফুল ভালবাসে। তাই ডেলো ও দুর্পিণদারা দুই পাহাড়ের মাঝে ফারে ছাওয়া ফুল আর ক্যাকটাসের দেশ স্কটিশ মিশনারীদের গড়া কালিম্পং যাওয়া স্থির হল। মনে মনে খুশী হলাম কেননা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত গৌরীপুর হাউস তথা 'চিত্রভানু' কালিম্পংয়ের এই বাংলোয় বসেই ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'জন্মদিন' কবিতাটি। এই পাহাড়ি শহরে টেলিফোন চালু হওয়া উপলক্ষে এই বাংলো থেকেই ২৫ শে বৈশাখ ১৩৪৫ কবির স্বকণ্ঠে উচ্চারিত কবিতা সম্প্রচার করেছিল আকাশবাণী।

খানিক গর্বভরেই রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং নানা স্মারক, তখনকার দিনের পেপার কাটিং ছবিগুলো ওদের দেখাতে উৎসাহিত হয়েছিলাম। স্বেতানা ওর ক্যামেরায় অর্কিড, ক্যাকটাসের মতো এই সংগ্রহশালার নানান ছবি তুলে রাখছিল। যদিও রক্ষণাবেক্ষণের অব্যবস্থা এবং বাংলোটির ভগ্নদশা সম্পর্কে তার অভিযোগ শুনে আমাদের মুখটা চুপসে গেল। কদিন পরে সংবাদপত্রে দেখলাম কালিম্পংয়ের বাঙালীদের সংগঠনের সভাপতি মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্মকর্তা সুকুমার ঘোষালরা রীতিমত আতঙ্কিত এই বাংলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে, তাদের অভিযোগ এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর নজর পড়েছে এই বাড়িটির উপরে। কবি শঙ্খ ঘোষও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন অবিলম্বে বাড়িটি সরকারের অধিগ্রহণ করা উচিৎ, নাহলে চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে এক অমূল্য রবীন্দ্র স্মারক।

পরদিন বাগডোগরা হয়ে স্বেতানারা চলে গেল দিল্লীতে। ক্ষণিকের জন্যেই এসেছিল, জানি না কি স্মৃতি ওরা নিয়ে গেল। সেই স্মৃতি কি এই রকম :

সাইড সিন এর সময় মাঝে মধ্যে স্বেতানার মা নিজে হাতে তৈরী কেক, চকলেট দিচ্ছিল। খাবার পর মোড়কগুলো গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে ফেলছিলাম। আমার বৌ নিঃশেষিত জলের বোতলটা বাইরে ফেলে দিলে পাহাড়ের ঢালে পাইন গাছের গোড়ায় আটকে গেল। পাশে কোন দেশওয়ালীর ছোড়া মাজা বা ফ্রুটির মুখ থেকে বেরিয়ে আসা স্ট্রটা মুখ বেঁকিয়ে তাকে অভিনন্দন জানালো। কিন্তু স্বেতানারা সঙ্গের ক্যারিব্যাগে মোড়ক, ফলের খোসা, খালি ক্যান্টেনার রেখেছিল, হোটেলে ফিরে সেগুলো ভ্যাটে ফেলে দিল। পরে আলোচনা করছিলাম আমরা কত অসভ্য, শিক্ষা পেলাম, এরকম যেন আর না করি। ওরা চলে যাওয়ায় বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। ভাবছি এই শিক্ষাটা ছাড়া আর কি দিয়ে গেল। যা দিয়েছিল ফেরার পথে ট্রেনের মধ্যে সেটা খুললাম। দেখলাম ব্যাক কভারে লেখা রয়েছে ঃ

নিকোলা ভাপৎসারভ (১৯০৯-১৯৪২) একজন বুলগেরিয়ান লেখক। বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয়ান কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি ছিলেন আমূল পরিবর্তনকামী আধুনিকতার সমর্থক। তার সৃষ্টিকে মায়াকোভোস্কি এবং লোরকার সঙ্গে তুলনা করা হয়। তিনি ছিলেন একজন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, দমকলকর্মী, কারখানা-শ্রমিক, রেলওয়ে কর্মী, ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য এবং একজন কমুনিস্ট। বুলগেরিয়ার প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্যে তাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হত্যা করা হয়। তখন তার বয়স ছিল তেত্রিশ।

তার জীবিত কালে মাত্র একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। নাম ''মোটর সংস'' (Motor Songs) তার মৃত্যুর পর থেকে তার কবিতা পঞ্চাশের বেশী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। তার কবিতা দ্রুত, বাস্তব, তর্কপ্রবণ, কথ্যভাষায় লেখা, কমুনিস্ট ভাবাদর্শের সাধারণ প্রকাশরীতি অতিক্রম করে তিনি তার কাব্যভাষায় অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন সিনেমা, রেডিও, বিজ্ঞাপন, জনপ্রিয় সংস্কৃতি এবং আধুনিক টেকনোলজির বিভিন্ন ক্ষেত্রের শব্দভান্ডার।

সেই থেকে মাথাটা চমচম করছে। লোরকা মায়াকোভোস্কির বাংলা অনুবাদ দেখেছি কিন্তু ভাপৎসারভ তো দেখিনি। পরে জানতে পারলাম একেবারে যে হয়নি তা নয়। বিশেষ করে কবি সরোজ দত্ত ১৯৪৩ এ ফ্যাসি বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে Friends of Soviet Union-এর কাজকর্ম দেখাশুনা করার সময়েই 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় ভাপৎসারভের কবিতা অনুবাদ করেন। 'একটি কাহিনী' কবিতায় বুলগেরিয়ার ত্রাসের রাজত্বের ধ্বংসের জন্যে সোভিয়েতের সাথে মৈত্রীর কথা বলা হয়েছে যা তাৎপর্যপূর্ণ। প্রসঙ্গত এ বছর কবি সরোজ দত্ত'র জন্মশতবার্ষিকী। পুলিশের গুলিতে নিহত বুলগেরিয় কবির কবিতা অনুবাদ করেছেন অন্যদেশের এমন একজন কবি যিনিও পরবর্তীকালে পুলিশের গুলিতেই নিহত হন। দুটি দেশের দুটি জীবন দুটি ভাষার প্রতিবাদ যেন একই পথে মিশে যায়।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও বেশ কিছু কবিতা অনুবাদ করেন। তিনি মস্কোয় গেলে মাদাম বিকোভার যিনি প্যাচ্যতত্ব সংস্থায় বাংলা ভাষা নিয়ে কাজ করতেন তার স্বামী বুলগেরিয় ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক তাকে ভাপৎসারভের কথা বলতেই মূল ভাষায় কবিতা পড়ে গেলেন এবং তার বাংলা তর্জমা শুনে তিনি অবাক। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলছেন : নিকোলা ভাপৎসারভের জীবনই আমাকে তার কবিতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। নিকোলা ভাপৎসারভ লিখেছেন সংগ্রামের কবিতা-যা তার জীবন থেকে উঠেছে। তার কবিতায় তাই নীরক্ত পাণ্ডুরতা নেই, প্রগলভ চিৎকার নেই। আছে যন্ত্রণার কথা, ভালবাসার কথা। আছে দাঁতে দাঁত দিয়ে সংগ্রামের কথা। আছে মানুষের অনিবার্য জয়ের কথা। অফুরন্ত আশার কথা।

কবি সরোজ দত্ত ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের অনুদিত দু-চারটি কবিতার পুনর্মুদ্রণ সহ সহযোগী কবি বন্ধুদের আগ্রহী অনুবাদে 'উল্টো দূরবীন' এর আস্ত একটা ভাপৎসারভ সংখ্যাই হয়ে গেল।

অমিত চক্রবর্তী
১০.১০.২০১৪

নিকোলা ভাপৎসারভের কবিতা

পুনর্মুদ্রণ

ক্ষুধিত সন্তানদের প্রতি.

উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর
রুটি যা জুটেছে
তাতে পেট ভরবে না কারো।
একি রুটি না ঠাট্টা!
হালের ফলায় শতধাদীর্ণ ক্ষেতের বুকের মত
চোখের জলের শুকনো দাগে ভরা তোদের মুখ।
কী বোবা, কী বাধিত, কী নিষ্প্রভ ও চোখ!
ঐ ব্যথা-বিস্ফারিত চোখের বিহ্বল চাউনি থেকে
একটা গা শিউরে-ওঠা আর্তচীৎকার উঠে আসছে :
রুটি,রুটি, রুটি!
শোন তবে, বাছারা আমার,
সোনা মাণিকরা আমার, শোন!
কাল ছিল যেমন
আজও ঠিক তেমনই আছে।
ভাঁড়ার আমার শূন্য,
তোদের মুখে দেবার মত কিছুই নেই আমার।
তাই রুটির বদলে আর কিছু দিচ্ছি আজ তোদের,
দিচ্ছি বিশ্বাস।

এমন দিন আসবে
যেদিন কালের স্রোতস্বিনীর গতিশক্তিকে
বন্দিনী করে সেবিকায় পরিণত করব আমরা,
প্রতিদিনের বৃষ্টিধারাকে আটকে
জমিয়ে রাখব কংক্রীটের চৌ-দেয়ালে,
বেরিয়ে যেতে দেব না কোন পথে।
উদ্ধত হাতে রাশ টেনে ধরব নদীগুলোর,
বলব:
''ও পথে নয়, এই পথে।''—
কথা শুনবে ওরা,
কথা শুনবে পোষমানা জানোয়ারের মত।
সেদিন রুটি মিলবে আমাদের
হ্যাঁ, রুটি মিলবে।
আর খুশির হাসি উপ্‌ছে পড়বে
তোদের চোখের পেয়ালা থেকে।
সেদিন যদি রুটি মেলে আমার
রুটি মিলবে তোদেরও,
যদি রুটি মেলে তোদের
রুটি মিলবে কোটি কোটি মানুষেরও।
সেদিন জীবন ভরে উঠবে
আনন্দের দুর্নিবার জোয়ারে,
আর, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে
যক্ষ্মার পোকায়-কাটা অতীতের দিনগুলো।
সেদিন গান গাইব আমরা,
কাজ করব আর গাইব গান,
মানুষের মহিমা-বন্দনার উচ্ছ্বসিত আনন্দগান।
যখন বুড়ো হব,
জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকব দীর্ঘ পথের দিকে
দেখব তোরা ঘরে ফিরছিস
পায়ে পায়ে প্রাণোচ্ছ্বাসের ঢেউ তুলে।
তখন আস্তে আস্তে বলব
''কী চমৎকার এই পৃথিবী!''

একদিন এ হবেই হবে।
কিন্তু আজ,
আজ ঘরে রুটি নেই
আজ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে তোদের মায়ের বুক।
নালিশ জানিয়ে লাভ কি!
কোনো নালিশ নেই আমাদের।
তবু বুকের গভীরে আমার
মর্মমূল কেটে দিচ্ছে যন্ত্রণার বজ্রকীট।
তোদের এই 'আজ'
এ যে আমার কত বড় গোপন ব্যথা কী বলব।
কিন্তু তবু বলি বাছারা আমার,
ভয় করিসনে 'আগামী কাল'-কে,
সে যে তোদেরই।

একটি কাহিনী

রেডিওতে উত্তেজিতভাবে বিতর্ক করে চলেছে লোকটা,
কাকে উদ্দেশ করে বলছে ও?
কে জানে।
হয়ত জনসাধারণকে।
বলতে দাও ওকে,
এই বলার জন্যই ত' ও টাকা পায়!

লোকটা বলে চলেছে :
''রাষ্ট্রের শক্তি,
রাষ্ট্রের প্রভুত্ব
প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে তোমার স্বার্থ রক্ষায়।
বন্ধ করো শ্লোগান!
নামিয়ে ফেলো ঝান্ডা!
সবাই তুষ্ট, সবাই তৃপ্ত, সবাই সুখী।''

কফিখানায় একটা লোক ঘৃণায় থুতু ফেলে,
তারপর জোরে পায়ে মাড়িয়ে ধুলোয় মিশিয়ে দেয় থুতুর দলাটাকে।।
চারিদিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলে,
''কুত্তার বাচ্চারা আমাদের সাথে চালাকি করতে চায়!
কিন্তু ভগবান তো শাস্ত্রে লিখেছেন—
জনসাধারণের কণ্ঠস্বরই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর।''
''ঠিক বলেছ।''
চীৎকার করে ওঠে কোনো ক্ষুধার্ত শীতার্ত যুবক।
বলে, ''এ কথাই না শালারা বলেছিল
উনিশ শ' পনের সালে?

যদি ওরা আমাদের মরতে বলে,
যদি বাধ্য করে বুলেটের মুখে দাঁড়াতে,
তাহলে নির্বোধেরা পর্যন্ত স্বীকার করবে,
জবাব দেওয়ার সময় এসেছে আমাদের।

এই আমার বিশ্বাস,
কারণ, কোকের চেয়েও কালো আমাদের রুটি,
আমাদের তেলের ভাঁড় শূন্য ঃ
আমাদের একটি মাত্র শ্লোগান—
ধ্বংস হোক এই ত্রাসের রাজত্ব
মৈত্রী হোক সোবিয়েত ইউনিয়নের সাথে।"

অনুবাদ : সরোজ দত্ত

কারখানা

নিচে কারখানা।
আকাশে মেঘের মত ধোঁয়া।
লোকগুলো সাদাসিধে
একঘেয়ে বেয়াড়া জীবন।
মুখোস পড়েছে খসে
রং গেছে চটে—
জীবনকে মনে হয়
যেন দাঁত-খিঁচোনো কুকুর।
কিছুতে ছেড়ো না হাল, লেগে থাকো—
নেই দম ফেলবার সময়।
লোম খাড়া করে আছে
ক্রুদ্ধ জানোয়ার—
দাঁত থেকে তার
তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে হবে।

চাকার জড়ানো বেল্ট ঠাস্ ঠাস্ শব্দ করে,
ক্যাঁচর কোঁচর শব্দে
মাথার উপরে শ্যাফ্ ট্ ঘোরে।
বন্ধ ঘরে খেলে না বাতাস,
বুক ভরে
মেলে না নিশ্বাস।

বাইরে তাকিয়ে দেখ,
বসন্তের হাওয়া
দোলায় মাঠের ধান,
হাতছানি দিয়ে ডাকে রোদ,
আকাশে হেলান দিয়ে গাছ
ছায়া ফেলে
কারখানা-প্রাচীরে।

অনাদরে দূরে ঠেলা
আদিগন্ত মাঠ—
কোনদিন কি ছিল চেনা?
মনেও পড়ে না।
আকাশ নিক্ষিপ্ত হল আঁস্তাকুড়ে,
স্বপ্ন ছিল—
তাও।
কেননা তোমার চোখ
যন্ত্রে থাকবে আঁটা,
মন উড়ু-উড়ু হলে মুহূর্তের ভুলে
হাত যাবে উড়ে।

চিৎকারে ডোবাতে যদি পারো
যন্ত্রের ঘর্ঘর শব্দ,
যদি তুমি তুলতে পারো গলা
মেশিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে—
তাহলে শোনাতে পারো কথা।
তারস্বরে আমার চিৎকার
সেই কবে থেকে—
অনাদি অনন্তকাল ধরে।...

কারখানা,
কলকব্জা
এবং দূরের ঐ
অন্ধকার ঘুপ্চির মানুষ—
শুনেচি সবাই নাকি সমস্বরে করেছে চিৎকার।
এ চিৎকারে তৈরি হওয়া ইস্পাতের পাতে
আমাদের হাতে
কঠিন দুর্ভেদ্য বর্মে আবৃত জীবন।
এই যজ্ঞে একবার বাধা দিয়ে দেখ—
আগুনে নিজের হাত নিজেই পোড়াবে।
হে কারখানা!
আমাদের চোখ বুঝি বেঁধে দিতে চাও
ধোঁয়া আর ঝুলকালি দিয়ে?
বৃথা চেষ্টা!
কারণ, তোমারই কাছে
শিখেছি সংগ্রাম করতে।
আমরাই এ মাটিতে
ডেকে এনে বসাব সূর্যকে।

খেটে খেটে কত লোক হাড় কালি করে
তোমার শাসনে জলে পোড়ে;
সহস্র বক্ষের হৃদ্স্পন্দনে তবুও
দেখি তালে তাল দেয়
তোমার হৃদয়।।

স্মৃতি

আমার কাজের সঙ্গীটিকে
মনে পড়ে
—কী ভালো যে ছিল সে ছেলেটি।

দোষ তার একটাই ছিল শুধু কাশত।
কাশতে কাশতে হয়ে যেত নীল।

বয়লারে আগুন দেওয়া—
প্রত্যহ রাত্রের শিফ্‌টে
পুরোদমে বারো ঘণ্টা কাজ।
ঘাড়ে করে বস্তা বস্তা কয়লা বইত,
পুড়ে গেলে ফেলে আসত ছাই।

ঝুলকালি ভেদ করে
আমাদের নিরুদ্ধ পিঞ্জরে
ক্বচিৎ কখনও যদি দেখা দিত
একফালি রোদ—

দৃষ্টি তার কী আগ্রহ মেটাত পিপাসা।
তার সে চাতক দৃষ্টি
চোখ বুঁজলে আজও দেখতে পাই।

যখন বসন্ত আসত
দূর থেকে
ভেসে আসত পাতার মর্মর।
ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়ে যেত
আকাশে বলাকা—
কী দুরন্ত পিপাসায়
সে হত কাতর!
চোখে তার আবেদন,
দুঃসহ বেদনা—
কী যে দুর্বিষহ সে বেদনা!

বসন্ত আবার যেন ফিরে আসে
আরেকটি বসন্ত যেন দেখে যেতে পারি—
এই তার করুণ মিনতি।

একদা বসন্ত এল
রূপ যেন ফেটে পড়ছে,
সঙ্গে সূর্য।
স্নিগ্ধ হাওয়া,
ফুটন্ত গোলাপ

মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ
বয়ে আনল
চাঁপার সৌরভ।
আমরা রইলাম তবু
যে তিমির সেই তিমিরেই
বুকে নিয়ে জগদ্দল পাথরের ভার।
হঠাৎ একদিন
জীবনের তাল গেল কেটে।

বয়লারে গোলমাল দেখা দিল
কী কারণে কিছুই জানি না।
প্রথমে ঘড়ঘড় শব্দ,
তারপর একেবারে চুপ।
হয়ত বা সেই ছোকরা
মরেছিল বলে।

অথবা আমারই ভুল।
চেয়েছিল হয়ত সে
বয়লার!
আগুনে ইন্ধন দিক
পরিচিত হাত।

হলেও তা হতে পারে
জানিনা সঠিক।

মনে হল, ফোঁপাতে ফোঁপাতে
অস্ফুট কাতরস্বরে বলছিল বয়লার :
‘কোথায়, কোথায় গেছে বলো সে ছেলেটি!’

সে ছেলেটি?
মারা গেছে।
বাইরে বাড়াও মুখ, দেখ—
বসন্ত এসেছে।
দূরে বহুদূরে
পাখিরা আকাশে উড়ছে।
আর কোনোদিন
সে ছেলেটি এ দৃশ্য দেখবে না।

আমার কাজের সঙ্গীটিকে
মনে পড়ে
—কী ভালো যে ছিল সে ছেলেটি!
দোষ তার একটাই ছিল শুধু
কাশত।
কাশতে কাশতে হয়ে যেত নীল।

বয়লারে আগুন দেওয়া—
প্রত্যহ রাত্রের শিফ্‌টে
পুরোদমে বারো ঘণ্টা কাজ।
ঘাড়ে করে বস্তা বস্তা কয়লা বইত
পুড়ে গেলে ফেলে আসত ছাই।।

রোমান্স

আজ
যে কবিতা
রচনা করার ইচ্ছা

তাতে
ছত্রে ছত্রে
থাকে যেন
একালের সুর—

স্পর্ধায়
যেমন করে
দৈত্যকায় ডানা

ঝাঁট দেয়
এ পৃথিবী
মেরু থেকে মেরু

কেন লোকে খেদ করে?
অতীতের জরাজীর্ণ
স্বপ্নজাল নিয়ে
কেন ফেলে দীর্ঘশ্বাস এত?

নীল মহাশূন্যে গতিমুখর ইঞ্জিনে
আজকের রোমান্স,
আগে সে-গানের বোঝা ধ্রুবপদ
আশা ছেড়ো পরে।

সেই গান আনে
ইস্পাতের স্ববশ ডানার
দারুণ দৃঢ়তা
মানুষের প্রাণে।

অচিরকালের মধ্যে এই সব পাখি
ভূমিতে
ছড়াবে বীজ।

আকাশে বাতাসে তোলে প্রতিধ্বনি
পাখিদের গান
মানবমুক্তির নামে
জয়ধ্বনি দেয়।

পাখা মেলে হবে তারা পার
মহাসমুদ্রের নীল জল
গ্রীষ্মমণ্ডলের রাঙা মাটি
সবুজ জঙ্গম শস্য
চিরতুষারের শুভ্র দেশ।

ছোট ছোট গণ্ডী ভেঙে দিয়ে
পৃথিবীকে
আলিঙ্গনে বেঁধে

বিমানে গতির পাল্লা
জন্ম দিচ্ছে,
সস্নেহে লালন করছে, দেখ—
নতুন রোমান্স।

শেষকথা

ভেঙেছে বাঁধ হৃদয়হীনতার ঢেউ—
লোকে বলছে,
রামরাবণের যুদ্ধ।
আমি যাচ্ছি।

জায়গা নেবে আর কেউ
কে গেল কে এল—সে নাম তুচ্ছ।

এই তো সহজ নিয়ম, এই তো বাস্তব
এক বুলেটে—
কৃমিকীটের খাদ্য
ছুটে আসব আবার,
প্রিয় ভাই সব,
বজ্রে যখন বাজবে ঝড়ের বাদ্য।

অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সোফিয়াতে ভাপৎসারভের ভাস্কর্য

নিকোলা ভাপৎসারভ ও তার কবিতা

গিয়োর্গি গসপডিনভ

অনুবাদ : শম্ভু ভট্টাচার্য

যখন আমি ১০ আমার মা আমাকে নিকোলা ভাপৎসারভের কবিতার একটি বই উপহার দেন। ঐ বয়সে ছেলেরা সাধারণত অন্য রকমের উপহার পায়, এবং আমি নিশ্চিত ছিলাম না আমার ধন্যবাদটি কতটা আন্তরিক ছিল। খণ্ডটি ছিল একটি জুবিলি সংস্করণ—বাঁধানো, ভারি ও কালো। যাই হোক সন্ধ্যার শেষদিকে আমি বইটি খুলে অবিচারিত ভাবে পৃষ্ঠাগুলি ওল্টালাম এবং সেই থেকে ২৮ বছর ধরে নানা শহর ও নানা অঞ্চলে যেতে হলেও আমি কখনোই বইটিকে ছেড়ে থাকিনি। আমি যখন ভাপৎসারভ-বিষয়ে আমার পিএইচ.ডি. থিসিসটি লিখি, তখনও আমি ঐ খণ্ডটিই ব্যবহার করেছি। আমার শৈশবের কিছু অমূল্য সম্পদ এখনও ঐ বইটির পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে দেখা যাবে : ১৯৭৯-র শরতে গাছ থেকে ঝরা একটি হলুদ পাতা, একটি মিঠাইয়ের মোড়ক, প্রেমের একটি নামহীন ঘোষণাপত্র যা আমি সপ্তম মানে পড়ার সময়ে পাই। ধন্যবাদ, মা।

এই বৎসরগুলির নানা পর্যায়ে ভাপৎসারভের কবিতা পাঠে আমার অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ধারাগুলিকে আমি এখন পুনর্নির্মাণ করতে চাই। আমি নিশ্চিত নই এই পুনর্নির্মাণটি স্মৃতির কাজ নাকি নিজের মতো করে বলার, কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে এটি তিনি কিভাবে তাঁর পাঠকদের বিভিন্ন বয়সকালেও আবিষ্ট করে চলেন তা বোঝার একটি আকর্ষণীয় উপায়। যা দশ বৎসর বয়স্ক বাচ্চাটিকে মগ্ন করে রাখতো, বাচ্চাটির নিজের ভাষায় তা ছিল, প্রচুর ঘটনা আর সরাসরি বলা (আমরা বর্ণনা একেবারেই পছন্দ করতাম না)। অথবা, আজকের অ্যাকাডেমিক পরিভাষায়, ক্রিয়াপদ ব্যবহারের গহন ঘনত্ব এবং প্রত্যক্ষ প্রজ্ঞাপনধর্মিতা। আপনি ভাপৎসারভের কবিতায় এসব প্রচুরই পাবেন। ছেলেবেলার পড়া থেকে মনে পড়ে 'যার হৃৎপিণ্ডে গুলি করা হয়েছে/এমন একটি চিতার মতো' ('বিশ্বাস')। ভাপৎসারভ অতি সহজেই আমাদের শিশুমনে প্রবেশ করতেন এবং শীঘ্রই আমরা বিনা আয়াসেই তাঁর কবিতাগুলি মনে রাখতে শুরু করলাম। আমি এখনও মনে করি যে এটি তাঁর কবিতার অন্যতম শক্তি। মনে আছে, প্রত্যেক পরিস্থিতির জন্য তাঁর কবিতা-বিশেষ আমার তৈরিই থাকতো। যখন কোনো সহপাঠীর সাথে মুষ্টি-বিনিময় শুরু হতো, আমি সাথে সাথেই হুঙ্কার দিতাম : 'আমাদের মধ্যে একজন হারবে/আর হেরে যাওয়া লোকটি হলে তুমি ('দ্বন্দ্বযুদ্ধ')। এই আত্মপ্রত্যয়ী শক্তির মধ্যে গ্ল্যাডিয়েটরদের কিছু, স্পার্টাকাসের কিছু ছিল এবং আমরা তার জন্যে পাগল ছিলাম। আমরা বড় হতে থাকলাম আর কবিতাগুলিও প্রিয় হয়ে উঠতে থাকলো।

যখন আপনার ভীষণভাবে নিবিড় কিছু দরকার তখনও ভাপৎসারভ আপনার হাতের কাছেই আছেন এবং তা, তৎকালীন কমিউনিস্ট অনুশাসনের বিপরীতেই। আমার যুগসন্ধিকালীন পাঠ হতে 'বসন্ত' কবিতাটি মনে আসে, এবং 'চিঠি' কবিতাটি ('সমুদ্র আর যন্ত্রগুলির কথা তোমার কি মনে পড়ে?')। এবং 'বিদায় সম্ভাষণ' কবিতাটির দুটি স্তবক, বিশেষত এই পঙক্তিটি : 'কখনও কখনও আমি তোমার স্বপ্নের ভিতরে ঘরে ফিরবো'—সবচেয়ে নিরাসক্ত স্কুলছাত্রীরও হৃদয় গলিয়ে দিতো। ভাপৎসারভে সব সময়ে কাজ হতো।

আমি এইসব গল্প দিয়ে শুরু করলাম কারণ আমার মনে হয় যে, ভাপৎসারভের মতো কবিগণের সাথে আমাদের নিজেদের জীবন এক সুতোয় বোনা এবং এই কারণে যে অনেক বছর তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কবিতা-বিষয়ে এইভাবে লেখা সম্ভব ছিল না। ছিল পূর্বনির্ধারিত রেডিমেড গতানুগতিক বুলি, ভাবাদর্শগত প্রতীক, ফাঁপা বিমূর্তকরণ এবং অতি ব্যবহারে জীর্ণ উপমার সমাহার। সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তক ও সমালোচকদের বিশ্লেষণগুলিতে তাঁকে শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি ও বিপ্লবের প্রতি নিবেদিত-প্রাণ ও শ্রমিকের উত্তোলিত বাহুসহ কনক্রিটে নির্মিত একটি বিশাল মূর্তিরূপে উপস্থাপনের উপরে জোর দেওয়া হতো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ভাপৎসারভের কবিতা তাঁদের ব্যাখ্যার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের প্রত্যেক জনই তাঁর তাঁর নিজস্ব, ভিন্ন, ভাপৎসারভপাঠ করতে পারেন—ঘনিষ্ঠ, সৌম্য, গীতল, কখনও কখনও মরিয়া, কখনও কখনও শ্লেষাত্মক, 'অপ্রত্যাশিত'।

এমন অনেক কবি আছেন যাঁদের কবিতায় প্রবেশের জন্য আপনার তাঁদের জীবনী জানার দরকার নেই। ভাপৎসারভের ক্ষেত্রে, ভালোর জন্যে হোক বা মন্দের, জীবনের ইতিহাস ও কবিতার ইতিহাস দুয়ে মিলে এক। ১৯০৯-এ তিনি পিরিন পর্বতের পাদদেশের ছোট এবং চিত্রোপম শহর বাঁস্কোতে জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক দিক হতে অশান্ত ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশের অংশ হওয়ায় এখানে বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠনের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। তাঁর জন্মের সময়েও বাঁস্কো অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাঁস্কো ১৯০৩-এর 'সেন্ট এলিজা দিবস'-এর অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত ছিল কিন্তু ১৯১২-তে বুলগেরিয়ার অংশ হয়। তাঁর বয়স তখন তিন।

তাঁর বাবা, ইয়োঙ্কো ভাপৎসারভ ছিলেন ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে বিখ্যাত বিপ্লবীদের একজন। তিনি কুখ্যাত 'মিস স্টোন ঘটনা'-র সাথে যুক্ত ছিলেন, যে ঘটনায় একজন আমেরিকান মিশনারীকে পণবন্দী করা হয়েছিল। ধনী এবং বুলগেরিয়ার 'জার' ইয়োঙ্কো ভাপৎসারভকে সময়ে সময়ে 'পিরিনের জার' বলা হতো কারণ কার্যত তিনিই অঞ্চলটি শাসন করতেন। পরিবারে তিনি ছিলেন ক্ষমতাধর ও প্রভুত্বকারী এবং তাঁর সন্তানরা তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভয় করতো। ভাপৎসারভের মা, এলিনা ভাপৎসারোভা ছিলেন ভাপৎসরভের বাবার বিপ্রতীপে—তিনি ছিলেন একজন অনুভূতিসম্পন্না ও বুদ্ধিমতী মহিলা, ধর্মে প্রোটেস্টান্ট এবং সমোকভের আমেরিকান বোর্ডিং স্কুলে শিক্ষিতা। ভাপৎসারভ সারা জীবন তাঁর উদ্যোগগুলির (যেগুলি প্রায়শই তাঁর বাবার কাছ হতে গোপন রাখা হতো) জন্যে তাঁর মায়ের দিক হতে সান্ত্বনা এবং সমর্থন পেয়েছেন, উভয়ের মধ্যেকার রক্ষিত চিঠিপত্রগুলি এর প্রমাণ। ভাপৎসারভের শৈশবে তাঁদের বাড়িতে যেসব প্রভাবশালী ব্যক্তি এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বুলগেরিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম এবং বিপ্লবী পেইয়ো ইয়াবরভ, 'জার' ফার্দিনান্দ ও পরে তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী তৃতীয় বোরিস। ১৯১৮ তে জার্মানির সম্রাট কাইজার উইলিয়াম স্বয়ং দক্ষিণ ফ্রন্টের পথে তাঁদের বাড়িতে ওঠেন এবং তিনি ভাপৎসারভের মা, এলিনা ভাপৎসারোভার আচরণে এত মুগ্ধ হন যে তিনি তাঁকে একটি হিরের ব্রোচ উপহার দেন।

স্কুলের বছরগুলিতে ভাপৎসারভ প্রচুর বই পড়েন এবং তৎকালে প্রচলিত ও ছাত্রদের চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্যে গঠিত 'সোসাইটি'গুলির একটিতে যোগদেন। এই সময়েই প্রযুক্তিবিদ্যায় তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ১৯২৬-এ সতেরো বছর বয়সে কবি ঐ 'সোসাইটি'-র মুখপত্র 'সংগ্রাম'-এ তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশ করেন। কবিতাটির শিরোনাম ছিল অতি তরুণ বয়সসুলভ : 'উজ্জ্বল আদর্শগুলির দিকে।' ঐ বছরেই তিনি তাঁর বাবার চাপে ভার্ণার মেরিন মেশিনারি স্কুলে আবেদন করেন। তাঁর নিজের ইচ্ছা ছিল সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করার কিন্তু অত্যন্ত সৌম্য স্বভাবের জন্যে তিনি তাঁর বাবার ইচ্ছার বিরোধিতা করেননি যদিও মেরিন স্কুলের সামরিক অনুশাসনের মমতাহীনতা সহ্য করা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। ঐ দুর্বহ অনুশাসনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ও পরিবার হতে বিচ্ছিন্নতার পরিচয় আছে ঐ সময়ে তাঁর মাকে লেখা চিঠিগুলিতে এবং তৎকালীন সাহিত্যকর্মে। ১৯৩২-এ তিনি মেরিন স্কুলের পর্ব শেষ করেন ও ভূমধ্যসাগরের একটি জাহাজে সহকারী মেকানিকের পদে যোগ দেন ও এই কাজের সূত্রে আলেকজান্দ্রিয়া, ইস্তানবুল, হাইফা এবং সাইপ্রাসের 'বৃহৎ তারাদের নিচে' ('চিঠি') ভ্রমণ করেন। ঐ বছরেই স্কুলত্যাগকালীন অনুষ্ঠানে তিনি স্নাতকদের পক্ষ হতে বক্তৃতা দেন, বক্তৃতাটি স্কুলের তীক্ষ্ণ সমালোচনা এবং ছাত্রদের

ভবিষ্যৎ-ভাবনায় পূর্ণ ('বেকার যুবকদের আনন্দহীন নিশান' এবং 'রুটির জন্যে আপোষ')। তিনি ঘরে ফিরে এলেন এবং প্রথমে রেলের ইঞ্জিনে কয়লা দেওয়ার কঠিন কাজ করেন ও পরে কোচারিনোভো গ্রামের একটি কাগজকলে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারের পদে যোগ দেন। এখানে তিনি সাথে সাথেই শ্রমিকদের সাথে যুক্ত হন ও তাঁদের উদ্দেশে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া শুরু করেন। এখানেই প্রথম সাহিত্য ও নাটকে তাঁর আগ্রহ কিছুটা প্রকাশের সুযোগ পায়। তিনি একটি অপেশাদার নাটকের দল প্রতিষ্ঠা করেন—তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই দল ধ্রুপদী সাহিত্যের উপরে নির্ভর করে কুড়িটি নাটক মঞ্চস্থ করে এবং তিনি নিজেও সেগুলিতে অভিনয় করেন। এটা অদ্ভুত যে তাঁর এই পর্বের কবিতাগুলি টিকে নেই।

ভাপৎসারভের জীবন ও কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বৎসরটি হলো ১৯৩৬। 'নির্ভরযোগ্যতার অভাব'-জনিত কারণ দেখিয়ে তাঁকে বরখাস্ত করা হয় ও তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে সোফিয়াতে চলে আসেন। এখানে তাঁদের একটি পুত্রসন্তান হয় কিন্তু বাচ্চাটি কয়েক মাসের মধ্যে মারা যায়। তিনি 'স্টেট রেলওয়ে'-তে ইঞ্জিনের চুল্লিতে কয়লা দেওয়ার কাজ নেন :

'ঝিমুতে থাকা রেললাইনগুলি ঠক ঠক করছে।'
('বৌদ্ধিক কয়লা-জোগারের গান')

এই নাটকীয় ১৯৩৬-এই ভাপৎসারভ কবিতা প্রকাশ করতে শুরু করেন—সেইসব কবিতা যেগুলি শুধু তাঁর নিজেরই নয়, তাঁর জাতিরও সাহিত্য আন্দোলনের প্রামান্য অভিজ্ঞান। তাঁর লেখায় এখন দেখা গেল একজন সুদক্ষ কবিকে যিনি তাঁর প্রথম যুগের রোমান্টিকতা ও ছেলেবেলার শিক্ষানবিশিপনাকে বহু দূরে রেখে এসেছেন। এই সময়ে তিনি যে কবিতাগুলি লেখেন তার মধ্যে আছে : 'একজন অন্ধ মানুষ...', 'গোর্কি', 'পুশকিন', 'রোমান্স' ('আজ আমি একটি কবিতা লিখতে চাই'), প্রভৃতি। তিনি বামপন্থী প্রকাশন-সংস্থা হতে কবিতা প্রকাশ করতে থাকেন এবং রাজধানীর বামপন্থী সাহিত্যিক মহল ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগ দেন।

তাঁর সামনে সময় ছিল অতি সংক্ষিপ্ত, মাত্র ছ'টি বছর, এর মধ্যেই তিনি সৃষ্টি করেন তাঁর রচনাগুলি যা মূল্যবান উত্তরাধিকার-রূপে আমরা পেয়েছি। ১৯৩৭-এ 'রোমান্স' কবিতাটির জন্যে তিনি একটি কবিতা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন। নব-প্রতিষ্ঠিত 'রেডিও সোফিয়া' কর্তৃক আয়োজিত 'রেডিও নাটক' প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তিনি তাঁর 'বাঁধ' নাটকটির জন্যে দ্বিতীয় পুরস্কার পান (প্রথম পুরস্কার কাউকেই দেওয়া হয়নি)। এতে টাকা যা তিনি পেয়েছিলেন, তা দিয়ে, নিকট আত্মীয়দের স্মৃতি অনুসারে, তিনি একটি চেক্‌কাটা রেশমী জ্যাকেট ও পাতলুনে একটি আনুষ্ঠানিক সুট্ তৈরী করিয়েছিলেন। তাঁর বিচার চলাকালে ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময়ে তিনি এই সুট্‌টিই পরেছিলেন।

তাঁর স্ত্রী বয়কা ভাপৎসারোভা তারিখ মাস প্রভৃতির বিস্তৃত খুঁটিনাটি-সহ 'নিকোলা ভাপৎসারভের জীবন ও কার্যাবলী' প্রণয়ন করেছেন তাতে প্রমাণ হয় যে কিভাবে অভাবনীয় সৃষ্টিশীল কাজ এবং গভীর, গভীরতর গোপন বৈপ্লবিক কাজ একই সাথে চলেছিল। ভাপৎসারভের প্রথম ও একমাত্র কাব্যগ্রন্থ, 'মোটর সঙ্গীত'-ভুক্ত কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল ১৯৩৬-৩৯ সময়কালে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৪০-এ। তিনি নিজেই এর ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। কবিতাগুলি ছিল চারটি পর্বে বিভক্ত : 'মানুষের গান', 'স্বদেশের গান', 'গানগুলি' এবং 'একটি দেশের গান'। প্রথম কবিতা, 'বিশ্বাস' রচিত হয়েছিল প্রথাগত ভূমিকার বদলে। সমসাময়িক কালে প্রকাশিত অন্যান্য কবিদের প্রথম বইয়ের থেকে ভাপৎসারভের বইটি ছিল একেবারেই আলাদা। সমসাময়িক ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণে জোর দিয়েই বলা হয়েছে সাহিত্যপাঠের আসরে শ্রোতাদের আন্দোলিত করার ব্যাপারে তাঁর সক্ষমতার কথা। কিন্তু সাহিত্য সমালোচকদের প্রশংসা, প্রধানত আঞ্চলিক ও বিষয়নির্দিষ্ট কিছু প্রায়োগিক সংবাদপত্রে কিঞ্চিৎ উল্লেখ বা সমীক্ষা যদি না ধরা হয়, একেবারেই আসেনি। এমনকি সেই সময়ের অত্যন্ত চিন্তাশীল বামপন্থী সমালোচকদের দৃষ্টিতেও 'মোটর সঙ্গীত-এর মত উল্লেখযোগ্য কবিতা ধরা পড়েনি। তাঁর প্রতি ঘনিষ্ঠ কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিস্পৃহ এবং উচ্চম্মন্যতাদুষ্ট। তাঁর মাকে লেখা ভাপৎসারভের চিঠিগুলি থেকে জানা যায় যে তিনি কিভাবে এবিষয়ে নিজের অনুভূতি নিজের মধ্যে চেপে রেখেছিলেন।

এই ১৯৪০-এই ভাপৎসারভ প্রথম গ্রেপ্তার হন। নভেম্বরে তিনি নিজের জন্ম-শহর বাঁস্কোতে যান, উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্য চুক্তির বুলগেরিয়ার সরকারকে অগ্রসর করানোর লক্ষ্যে তথাকথিত 'সোবোলেব আন্দোলনে'র পক্ষে বিক্ষোভ সংগঠিত করার জন্যে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি পালন করা। যদিও বুলগেরিয় সরকার সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানি উভয়ের সঙ্গেই দৃশ্যত মিত্রতা করছিল তবুও ইতোমধ্যে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে বুলগেরিয়ার অক্ষ'-শক্তির পক্ষে যোগদান ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। বাঁস্কোতে তিনি পরপর অনেকগুলি গোপন সভা করেন। পরের মাসে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি হয়, তাঁর কিছু জিনিস বাজেয়াপ্ত হয় ও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচার যা এর পরে হলো তাকে সাহিত্যিক-রাজনৈতিক ভাবা চলে কারণ এর কেন্দ্রে ছিল ভাপৎসারভের কবিতা 'দেশ কাহিনি' যেটি তাঁর বাড়ি তল্লাশির সময়ে পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল বিরোধীদের প্রতিরোধ করার জন্যে জারি করা 'রাষ্ট্রীয় আরক্ষা আইনে' —কিন্তু ভাপৎসারভ অবিশ্বাস্যভাবে বিচারটিকে সাহিত্য, কবিতা ও গল্প-উপন্যাস বিষয়ক বিতর্কে পরিণত করেন, এই বিতর্কগুলির দলিল ও নথিগুলি পড়লে সেগুলিকে কয়েকটি আরও বিখ্যাত সাহিত্য মামলার আইনী বির্তকের দালিলগুলির (বোদলেয়র, ফ্লবার্ট ইত্যাদির) ছোট সংস্করণ বলে মনে হয়। মকদ্দমাকালজুড়ে ভাপৎসারভ জোর দেন কবি এবং একটি কবিতার বই প্রণেতা হিসেবে তাঁর মর্যাদার উপরে। সাক্ষী হিসেবে তিনি সে-সময়ের সবচেয়ে মান্য লেখকদের একজন, স্বেতোস্লাভ মিঁকভকে আহ্বান করেন। তিনি মিঁকভকে অনুরোধের স্বরে বলেন : 'আমার কবিতাগুলির প্রকৃতি নির্ধারণ করুন, দেখুন সেগুলির সাহিত্যমূল্য কতটা ও সেগুলি প্রতিভাসম্পন্ন কিনা এবং আমার সাহিত্যকর্মের একটি পূর্ণ মূল্যায়ন করুন।' এই অনুরোধে এমন কিছু ব্যক্তিগত ও করুণ দিক আছে যা আসামীপক্ষের সমর্থনে আইনী সওয়াল-জবাবের ঊর্ধ্বে। ভাপৎসারভ প্রতিস্পর্ধা জানাচ্ছিলেন একদিকে রাষ্ট্র ও তার নিস্পৃহ প্রতিষ্ঠানগুলিকে ও অন্যদিকে সেইসব সমকালীন কবিদের যাঁরা তাঁর কবিতার প্রশংসা করতেন না। সেই অতি সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে ভাপৎসারভ-কর্তৃক নিজের কবিতার সাহিত্যিক মূল্য জানতে চাওয়াটি হলো বুলগেরিয়ার সাহিত্যের ইতিহাসের সবচেয়ে দুঃখবহ প্রশ্ন।

অক্টোবর ১৯৪১-এ ভাপৎসারভ বেকসুর খালাস পেলেন। আদালত স্বীকার করলেন যে 'দেশ-কাহিনি' হলো একটি কবিতা। মনে হলো যেন সাহিত্য রাষ্ট্রীয় সেন্সরশিপকে হারিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কবি ইতোমধ্যে তীক্ষ্ণভাবে পুলিশের নজরে পড়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের শেষ বছরটিতে পুলিশ সম্ভবত তাঁকে একেবারে পায়ে পায়ে অনুসরণ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে রক্ষা করার বা তাঁকে অতি বিপজ্জনক আণ্ডারগ্রাউণ্ড কাজকর্ম থেকে তুলে নেওয়ার জন্য কোনো উদ্যোগ নেয়নি। তাঁকে 'Literaturen Kritik' ('সাহিত্য সমালোচক') নামে কিছুটা নীরস একটি পত্রিকার প্রধান সম্পদকের পদ দেওয়া হয়, কয়েকটিমাত্র সংখ্যার মধ্যেই মনে ছাপ ফেলার মতো পুনরুজ্জীবন ঘটান। ইতোমধ্যে ১৯৪১-এর শরতের শুরুতে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির 'মিলিটারি কমিশনে' যোগ দেন। এই ভয়ংকর রকমের কঠিন ও চরম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ যে ধরনের পেশাদারী দক্ষতা দাবি করে তা তাঁর ছিল না বললেই চলে। মাত্র এক সপ্তাহ পরে তাঁকে তাঁর প্রথম 'মিশনে' পাঠানো হয়— সোভিয়েত ডুবো জাহাজে ফিরে আসা রাজনৈতিক নির্বাসনপ্রাপ্ত কর্মীদের নিয়ে একটি গোপন সভা সংগঠিত করা। পুলিশ মনে হয় তাঁর পিছনে পিছনেই গিয়েছিল। তাঁর পরবর্তী দায়িত্বগুলির মধ্যে ছিল অস্ত্রের গোপন যোগান সংগ্রহ করা ও সেগুলি সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা পার্টির ছোট ছোট সশস্ত্র দলে বিভক্ত বা গোপন বাহিনীর কাছে পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি। 'মিলিটারি মিশনে'র প্রধান রাশিয়ায়

শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্ণেল সিভিয়াৎকো রোদোইনভ তাঁকে নিজের সহকারী হিসাবে নিয়োগ করেন যে 'ভাপৎসারভ একজন মেকানিক অতএব বিস্ফোরক প্রস্তুতে কাজের হবেন, ভাপৎসারভের একজন কমরেডের স্মৃতি অনুসারে, 'তিনি যে একজন কবি একথা ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয়নি।'

১৯৪২-এর মার্চ মাসের ৪ তারিখের ভোরে গোপন পুলিশ ভাপৎসারভকে গ্রেপ্তার করে। পরে জানা যায় কমিউনিস্ট সংগঠনের মধ্যেই পুলিশের চররা ছিল। চার মাস ধরে পুলিশ তাঁকে জেরা করে। তিনি সব দায় নিজের ঘাড়ে নেওয়ার চেষ্টায় স্বীকারোক্তি দেন। জেলখানায় তিনি স্মৃতি হতে উদ্ধার করে 'Bayer' এবং 'Sampa' নামে দুটি নতুন কবিতা লেখেন—তাঁর এই নোটবুকগুলিতে আমরা তাঁর অনেক কবিতার চূড়ান্ত রূপটি পাই। তিনি লেখেন 'বিদায় সম্ভাষণ' কবিতাটি ('কখনও কখনও আমি তোমার স্বপ্নের ভিতরে ঘরে ফিরবো...') এবং তাঁর 'সংগ্রাম, নির্দয়-নিষ্ঠুর' নামক কবিতাটির প্রথম স্তবকটি। তিনি জেলখানার 'সেল্'-এ আত্মহত্যার চেষ্টাও করেন। ইতোমধ্যে তাঁর মা জার বোরিসের সঙ্গে দেখা করার জন্যে বৃথা চেষ্টা করে চলেন (সেই জার বোরিস যিনি বাঁস্কোতে তাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন)।

জুলাই মাসের ৬ তারিখে ভাপৎসারভকে সামরিক আদালতে পেশ করা হয়। অভিযোগগুলি ছিল গুরুতর ঃ সশস্ত্র 'স্কোয়াড' তৈরী করা, অস্ত্র মজুত করা, সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতি নেওয়া, অন্তর্ঘাত প্রভৃতি। রাষ্ট্রীয় আরক্ষা আইন এমনিতেই ছিল ভয়াবহ, তাঁর উপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে নানা নতুন উপধারা যোগ করে একে আরও বিশেষ রকমের দানবীয় করে তোলা হয়েছিল। সাক্ষী হিসাবে তিনি মহিলা কবিদের অন্যতম, এলিজাবেতা বগ্রিয়ানাকে ডাকেন। মূল যে দুটি প্রশ্ন তিনি তাঁকে করেন সেদুটি হলো ঃ 'আমার কবিতার কাব্যমূল্য আছে কিনা ও সেগুলির দেশপ্রেমিক সত্তা আছে কিনা?' এবং 'আমার কবিতা বুলগেরিয় কাব্যসাহিত্যে অবদান রেখেছে কিনা?' বগ্রিয়ানার সংক্ষিপ্ত সদর্থক উত্তরগুলি বিচারের ফলাফলে কোনও প্রভাবই ফেলতে পারেনি, বস্তুত ফলাফলটি ইতোমধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। এবারে কবিতা মামলায় হারলো। কিন্তু ভাপৎসারভ এই ব্যাপারেই জোর দিচ্ছিলেন যে, তাঁকে যেন কবি হিসেবেই মনে রাখা হয়।

২৩ শে জুলাই ১৯৪২-এ আদালত রায় ঘোষণা করলো ঃ রাষ্ট্রবিরোধী কাজের অপরাধে নিকোলা ভাপৎসারভ ও আরও পাঁচজনকে 'ফায়ারিং স্কোয়াডের দ্বারা মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। বিচারক আরও যোগ করেন যে তাঁর রায়ই চূড়ান্ত, এর বিরুদ্ধে কোনো আবেদন বা 'অ্যাপিল' হবে না এবং রায়টি অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। কয়েক ঘন্টা পরে ভাপৎসারভ তাঁর 'সংগ্রাম, নির্দয়-নিষ্ঠুর' কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকটি রচনা করেন ঃ

'ফায়ারিং স্কোয়াড। এবং এর পরে পোকার দল। বাস্তবটিকে
অস্বীকার করা চলে না।'

কিন্তু দিনটি এখানেই শেষ হয়নি। শাস্তিপ্রাপ্তদের একজনকে তাঁর প্রেমিকাকে বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়। ভাপৎসারভ ঐ সংক্ষিপ্ত বিবাহ-অনুষ্ঠানটি দেখেন এবং এর মধ্যে শেষ বারের মতো তাঁর মা এলিনা ও স্ত্রী বয়কার সঙ্গে দেখা করেন। এক ঘন্টা পরে, রাত ন-টায়, ভাপৎসারভকে গুলি করা হয়।

পরবর্তী পঁইষট্টি বছরে ভাপৎসারভের কবিতার মূল্যায়নে অনেক পরিবর্তন এসেছে। আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে ভাপৎসারভের জীবনকালে বুলগেরিয় সাহিত্যসমাজ তাঁর প্রতিভা প্রকাশিত হওয়ার সময় পেয়েছিল খুবই কম। তবু তৎকালীন বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও যে এতটা ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন তা ভাবতে অদ্ভুত লাগে। ১৯৪৪-এ নতুন আমল (কমিউনিস্ট) শুরু হলে ভাপৎসারভের কবিতাগুলি ধীরে ধীরে নতুন সাহিত্য-ভাবনায় স্থান করে নিতে থাকে। এটি বলা জরুরী যে এই প্রামাণ্যীকরণের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল তলা থেকে। সে সময়ে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা তাঁর কবিতা পছন্দ করতো, তারা এগুলি আবৃত্তি করতো ও মুখে মুখে ছড়িয়ে দিতো—এই ব্যাপারটিই দলীয় নির্দেশমতো ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কমিউনিস্ট পার্টির কবিদের থেকে ভাপৎসারভকে পৃথক করে। এবং তবুও, ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে তাঁর কবিতার প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ণ ছিল মতাদর্শগত ক্লিশেতে আচ্ছন্ন। শুধুমাত্র বিপ্লবী যন্ত্রণার নিরিখে একপেশে কবিতাপাঠে পাঠে তাঁর কবিতার অর্থবিকারও ঘটে যাচ্ছিল এই সময়ে। স্ববিরোধী শোনালেও আমি বলতে চাই যে, কমিউনিস্টদের শাসনকালে ভাপৎসারভের কবিতাগুলি দ্বিতীয়বার ভুলভাবে পড়া হয়েছিল এবং একথা বলছি তাঁর কবিতার আরও সূক্ষ্ম ও জটিল অনুক্রমগুলিকে মাথায় রেখে। পার্টি-নির্দেশিত সাহিত্য-সমালোচনা জটিলতর পাঠ হতে তাঁর কবিতাকে 'রক্ষা' করতে ব্যস্ত ছিল পাছে ঐ ব্যাখ্যাগুলি পার্টি-প্রদত্ত 'সঠিক বিশ্লেষণ' হতে সরে যায়। ১৯৮৯-এর পরে (অর্থাৎ কমিউনিস্ট আমল শেষ হওয়ার পরে) আশঙ্কা দেখা দিল যে, তাঁর কবিতাগুলিকে হয়তো তৃতীয়বার 'সমালোচনা-মূলক অবমূল্যায়ন' সইতে হবে—এইবার এই অভিযোগে যে তিনি হলেন একজন বামপন্থী কবি এবং কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী।

যদি ভাপৎসারভের কবিতা শুধুমাত্র একটি মতাদর্শ ও একটি পার্টিরই কাজ করতো, তবে এখন যখন অন্তত বুলগেরিয় বাস্তবতায়, সেই মতাদর্শ ও সেই পার্টিকে অনেকটাই খাটো করে দেখা হচ্ছে, তখন আমরা আবার তাঁর কবিতার কাছে ফিরে যেতাম না। ভাপৎসারভ কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট সেই সব 'মিথ'-দের একজন হতেন যাঁরা পাতলা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন। কিন্তু 'পার্টি' শব্দটি তাঁর কবিতায় একবারও আসেনি। ভাপৎসারভকে আমাদের পড়তে হবে ইউরোপীয় বাম ও উদারপন্থী সংস্কৃতির প্রসঙ্গে এবং বিশেষত সেইসব কবি ও লেখকদের মাথায় রেখে, যাঁরা ১৯৩০ ও ১৯৪০ -এর দশকে ফ্যাসিবাদ-বিরোধীতাকেই একমাত্র সম্ভাব্য অবস্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, যেমন ঃ ফেডারিকো গার্সিয়া লোরকা, বার্টল্ট ব্রেখট্, সীজার ভ্যালেজো, সালভাতোর কোয়াসিমোদো, ইয়ানিস রিটসস্, পাবলো নেরুদা, লুই ম্যাকনীস।

এটা বিস্ময়কর নয় যে ভাপৎসারভের আন্তর্জাতিক খ্যাতির (তাঁর কবিতা পৃথিবীর ৫০টিরও বেশি দেশের ভাষায় অনূদিত হয়েছে) একটি বড় কারণ এই যে, তিনি ছিলেন বিপ্লব এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের কবি। এ হলো তাঁর কবিতার বার্তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু তাঁর কবিতার আরও এমন কিছু দিক আছে যেগুলিকেও উপেক্ষা করা চলে না, বিশেষত অন্যরকম অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন পাঠকদের কাছে তাঁর কবিতা পেশ করার সময়ে। শোনা দরকার নিবিড়তর ব্যক্তিগত সুরগুলি, লক্ষ্য করা দরকার দৈনন্দিন ভাষার প্রয়োগ ও সরল মানবনাট্যের ধারা ('ইতিহাস') যার দিক হতে বৃহত্তর ইতিহাস সব সময়ে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

এই সংকলনের কবিতাগুলি নির্বাচন করা হয়েছে ভাপৎসারভের কবিতার জটিলতর ও সমৃদ্ধতর দিকগুলি উপস্থাপন করার লক্ষ্যে। 'কিনো' শিরোনামটিতে যাঁরা চলে-আসা পদ্ধতিতেই তাঁর কবিতা পড়েন, তাঁরা কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। কিন্তু শিরোনামটি আপতিক পছন্দ নয় মোটেই—এর দ্বারা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে ভাপৎসারভের কবিতায় যে মিডিয়া-সংস্কৃতির ব্যাপাটির প্রয়োগ আছে, তার দিকে। ১৯৩০ ও ১৯৪০ এর দশকে রেডিয়ো, সিনেমা, তথ্যচিত্র ও বিজ্ঞাপনের জনপ্রিয়তার মাধ্যমে সংস্কৃতি ও মিডিয়ার মধ্যে সেই সম্পূরণমূলক সম্পর্ক শুরু হয় যার বদল আর সম্ভব নয়। এ হলো এক নতুন, বিশিষ্ট কৃষ্টির অভ্যুদয় জুর্গেন হাবেরমাস যাকে বলেছেন 'সম্পূরিত সংস্কৃতি'—আধুনিকতার সেই পর্ব যা মিডিয়ার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সৃষ্টি, বন্টন ও ভোগের ক্রিয়াগুলিকে একত্র করেছে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংলগ্ন রয়েছে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—একদিকে মিডিয়া এবং প্রোপাগাণ্ডা ও অন্যদিকে প্রযুক্তি এবং মতাদর্শের পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতা নতুন মিডিয়া কিছু মৌলিক ব্যাপারের পরিবর্তন ঘটালো। সাধারণ মানুষের কাছে পৃথিবীটা ছোট এবং দৃশ্যমান মনে হতে থাকলো, ঘটনাগুলি সাধারণ মানুষের অনেক কাছাকাছি চলো এলো এবং মানুষ যেন সেগুলির চিত্রলিপি দেখতে থাকলেন। নতুন মিডিয়া সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠলো। নতুন মিডিয়া মতাদর্শ ও প্রোপাগাণ্ডাকে এক নতুন কণ্ঠস্বর ও আওয়াজ দান করলো। হিটলার এবং

রুজভেল্ট রাজনৈতিকপ্রচারের কাজেপ্রথম রেডিয়োর সামগ্রিকব্যবহার করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলো পৃথিবীর প্রথম বেতারে প্রচারিত যুদ্ধ, 'রিয়েলিটি যুদ্ধ।'

ভাপৎসারভের কবিতায় ফিরে যাওয়া যাক। এখানে সিনেমা শুধু 'কিনো'-য় নেই, ভাপৎসারভের জনপ্রিয় কবিতাগুলিতে সেকালের সিনেমা ও ডকুমেন্টারী কাহিনিচিত্রের এতো কিছু আছে, যে, সেগুলিকে 'দৃশ্যমান উদ্ধৃতি'ও বলা চলে, যেমন, 'একজন অন্ধ মানুষ...; 'কাহিনি' ('তারা ক্রুপ্‌সে গ্রেনেড বানাচ্ছে'), 'ভয় পেয়ো না, বাচ্চারা,' 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ' এবং স্পেনীয় চক্রের কবিতাগুলি। এটা জানা যে ভাপৎসারভ নিয়মিতভাবে স্পেনের গৃহযুদ্ধের নিউজরীল দেখতেন, এর মধ্যে 'অবরোধ' নামে সেই বহু-আলোচিত নিউজরীলটিও ছিল যেটি ১৯৩৮-এ তিনি বহুবার দেখেছিলেন ঃ

'টোলেডো এবং মাদ্রিদে, বন্ধু,
আমি মরণশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যাবো।'

যা আকর্ষণীয় তা হলো, সিনেমাটোগ্রাফির টেকনিকগুলি যেভাবে তাঁর কবিতায় কাজ করে, সেই ব্যাপারটি। উদাহরণ হিসেবে, যে প্রকারে 'কিনো' কবিতাটির পৌর্বাপর্য, গঠন, সবকিছু ফিল্মটির বর্ণনের পর্ব- বদলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাটকীয় 'পজ', 'কাট্', এবং 'ক্লোজ আপ'-এ, বিশেষত চূড়ান্ত মুহূর্তে — সেই চুম্বন যা দর্শকদের কাছে এতো অসহ—তাতে বিন্যস্ত হয়, সেই দিকে মনোযোগ দিন। এবং এটি একেবারেই আপতিক নয় যে, ঠিক এই চুম্বনকালে, যা ফিল্মটি এবং কবিতাটি উভয়েরই চূড়ান্ত মুহূর্ত, কবি নিয়ে আসেন যেন চরম 'ক্লোজ আপ', যেন ক্যামেরার ক্ষমতার বাইরে, 'ফোকাসে'রও বাইরে, যাতে জনের ছবি চলে যায় 'আবছা ফোকাসে'। খুঁটিনাটিগুলি অমিত ও তিক্ত ঃ

'আবছা ফোকাস - পাওয়া জন
আগ্রাসী চুমু খাচ্ছে গ্রেটাকে
লুব্ধ শিশুর লালা তার ঠোঁটে।'

নাম দুটি আপতিক নয়। খুব সম্ভবত তাঁরা হলেন হলিউডের দুই নক্ষত্র, জন গিলবার্ট এবং গ্রেটা গার্বো।

সিনেমার মিথগত ভাষার বর্ণনা দিতে গিয়ে য়্যুরি লটম্যান বলেছেন যে, 'ক্লোজ আপে' সমস্ত চরিত্রগুলি দর্শকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। এইভাবে দেখলে চুম্বনটি জন ও গ্রেটার মধ্যে নয়, 'ক্লোজ আপ' ও দর্শকদের মধ্যে—'ক্যামেরার অবিহিতি' নিয়ে আসছে 'প্রত্যাখ্যানের অধিরোহণ।' ফিল্মের এই চুম্বন কবিতার দ্বিতীয়াংশে নিয়ে আসছে সবচেয়ে ক্রুদ্ধ প্রশ্ন ঃ

'এতে আমাদের কী করার আছে?
'নাটকটা' কোথায়?
এসবে আমি কোথায়? বলো?'

নান্দনিক অসন্তোষকে রাজনৈতিক অসন্তোষে পরিণত করার ক্ষেত্রে ভাপৎসারভ সর্বসেরাদের একজন। যা নান্দনিক দৃষ্টিতে অগভীর তা মতাদর্শের দিক হতেও অগভীর। 'একজন অন্ধ মানুষ...'-এ বরং অন্য রকমের চুম্বন আছে, ফিল্মটি যখন হলিউডের নয়, রাশিয়ার, তখন চুম্বনটিও হতে পারে সুমিত, অযৌন প্রায় জীবানুমুক্ত ঃ

'... একজন পুরুষ ও মহিলা চুমু খাচ্ছে কাঠবিড়ালীর লোমের
কোট পড়ে আছে তারা বরফ সোহাগ করছে তাদের....'

'কিনো'-তে কবিতার চৈতন্যের বাহ্য অংশ হলেন একজন মন্তব্যকারী দর্শক যিনি 'মুভি'-চিত্রটি পিছনে রেখে শ্রোতাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর বক্তব্যের পরে শ্রোতারা প্রোপাগাণ্ডার লক্ষ্য হয়ে ওঠেন। সিনেমাহলের প্ররোচক অন্ধকারে কিছু ঘটে এবং হলিউডী নাটকটি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সামাজিক-নাটকীয় বক্তৃতায় পরিণত হয়।

নতুন মিডিয়া তার নিজস্ব ধারায় কবিতার কেন্দ্রীয় বোধটুকুকেই শুধু নয়, তার আকারগত নির্মাণকেও প্রভাবিত করে : 'কিনো'-র প্রদর্শনমূলক ধাঁচা ও ফোকাসের কাজ, 'অ্যান্টেনা'-র ছত্রে ছত্রে রেডিয়ো স্টেশন বদল এবং 'কাহিনি' ('তারা ক্রুপ্‌সে গ্রেণেড বানাচ্ছে')-তে একদিকে বাণিজ্যিক ঢঙ ও অন্যদিকে প্রোপাগাণ্ডার বিষয় নিয়ে যুগপৎ বাজিকরী খেলার 'আয়রণি' :

'নতুন ভাইকার মেশিনগান, দেখা গেছে গুণে
সেকেণ্ডে দশজনকে মারতে পারে, এমনই এক খুনে।
সে-সবই স্রেফ উড়িয়ে দিতে আমাদের কড়া মাথা
অতএব ঘাবড়িযো না, মেজাজে থাকো, করো যা-তা।'

নিউজরীল ও ডকুমেন্টারীগুলি ঘটনাসমূহের যে দৃশ্যমানতা নিয়ে এলো তা পৃথিবীতে এক নতুন রাজনৈতিক নৈকট্যবোধের জন্ম দিল। পৃথিবীর নানা দেশে ঘটা সশস্ত্র সংঘর্ষগুলি, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, ধর্মঘটগুলি, গুপ্তহত্যাগুলি, পার্টি কংগ্রেসগুলি, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার মধ্যে আলোচনার খবরগুলি এবং ইত্যাকার সমস্ত ব্যাপার-সমূহের বর্ডার লোপ পেয়ে গেল—এই সমস্ত কিছুই একদিকে নতুন মিডিয়া-সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গকে ও অন্যদিকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করলো এবং এইভাবে সৃষ্টি করলো এক তীব্র ও সর্বপার্থিব রাজনৈতিক 'ঘটনা' যাতে সবাই সাকরেদ এবং কেউই নিরাপদ নন।

১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকের কবিতাগুলির অন্যতম বোধভূমি ছিল ব্যক্তির এই সর্বউপস্থিতময়তা, ঘটনাসমূহে অংশগ্রহণের এক বিশেষ অনুভূতি, ঘটনাগুলি কোথায় ঘটছে সেটা কোনো ব্যাপারই নয়—এই অংশগ্রহণ সম্ভব করেছিল মিডিয়া, ওর্তেগা গ্যাসেট যেমন লিখেছেন, 'পৃথিবীটা হঠাৎ বড় হয়ে গেল, সেই সাথে জীবনও ... প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথিবীর প্রতিটি ঘটনার সাথে বসবাস করেন।' ব্যাপারটি ভাপৎসারভের 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ' কবিতার নিম্নোধৃত পঙক্তিগুলির সাথে তুলনা করুন ঃ

'আমি এখানে
এবং সেখানে
সবখানে।
টেক্সাসের একজন শ্রমিক
আলজেরীয় জাহাজঘাটার একজন কুলি
একজন কবি
এবং আরও অনেক কিছু!'

এই কবিতার চিত্রকল্পগুলি নিউজরীলের আবহ সৃষ্টি করে। ব্যাপারগুলি যেন আমাদের চোখের সামনে ঘটছে, বর্তমান কালের ব্যবহারে ঘটনাসমূহের প্রক্রিয়াগুলি যেন এখনই ঘটছে—এখনও ধোঁয়া উঠতে থাকা বন্দুক, এখনও গরম থাকা লাশগুলি, ইত্যাদি। এইসব প্রকৃত-সময়ের ঘটনাগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে মূর্ত দৃশ্যায়নে—স্থির-ফটোগ্রাফিতে নয়, মিডিয়ার গতিধর্মে। একটি অতিরেক হলো সর্বউপস্থিতময়তার যুগপৎধর্মিতা। এক এবং অভিন্ন সময়ে নায়ক রয়েছেন 'খনিগর্ভে', 'একটি বস্তির কোনো দরজায়', 'মাথার উপরে মোটর-সঙ্গীত নিয়ে' এবং টেক্সাসে এবং আলজেরিয়ায়। প্রত্যেকটির একটি ভিন্ন ভাগ্য ও ভিন্ন ব্যক্তিত্ব আছে।

একই সময়কালের অন্যান্য বামমার্গী বিপ্লবী বুলগেরিয় কবিরা যেক্ষেত্রে বলশালী ও সরল বা সোজাসাপ্টা টাইপচরিত্র পছন্দ করতেন সেক্ষেত্রে ভাপৎসারভের কবিতার চরিত্রগুলির একটি শরীর এবং একটি ব্যক্তিগত গল্প ছিল। আকর্ষণীয় গল্প বলা, গল্পের মাধ্যমে তর্ক করা ('মানুষের গান'), ক্লিশেগুলিকে ভিতর থেকে ভেঙে দেওয়া—এইসব ব্যাপারে তাঁর প্রতিভার একটি বিশেষ সক্ষমতা ছিল। এটি তাঁর বিশেষ দিকগুলির একটি। রোলা বার্ত 'বামপন্থী মিথের দারিদ্র্য' সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 'এ হ'লো দরিদ্র মিথ, মূলগতভাবে দরিদ্র ... এর একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণের অভাব আছে—আকর্ষণীয় গল্প বলার ক্ষমতার অভাব।' ভাপৎসারভ ক্লিশেগুলিকে এড়িয়ে চলেন না, কবিতায় তাদের প্রবেশ করতে দেন এবং লঘু ও প্রায় অদৃশ্যভাবে সেগুলিকে অন্য কিছুতে পরিণত করেন। একটি অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলো তাঁর সর্বশেষ কবিতার এই পঙক্তিটি ঃ 'সংগ্রাম, তাঁরা যেমনটি বলা পছন্দ করেন, হলো একটি মহাকাব্য।'

আপনি চোখ খুললেই বিষয়টি দেখতে পারেন। কবিতা কথা বলছে। 'একটি মানুষের গান'-এ কবিতা শুধুমাত্র একজন মানুষের প্রতি একজন মহিলার মতো নরম, মৃদু স্বরে কথা বলতে পারে। কবিতা একটি সিনেমাহলের পরিপূর্ণ শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে কথা বলতে পারে এবং একটি হলিউড ফিল্মের মাধ্যমে তর্ক করতে করতে ক্রোধে বাকরুদ্ধ হতে পারে। কবিতা বিচলিত না হয়েই সমগ্র মানবতার ('অ্যান্টেনা' কবিতায়) বা ইতিহাসের (এই নামেরই কবিতায়) উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে পারে। এই সমস্ত কথোপকথনকেই মনে হয় যেন লঘু চালে, মনে হয় অতি সহজ, যেন একেবারে 'প্রকৃত জীবন' থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। ভাপৎসারভের কবিতা আমাদের ভাষাকে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে, জানে। আমি সেই সময়ের খবরের কাগজ ও পত্রিকাসমূহের শতশত পৃষ্ঠা পাঠ করেছি—নানা জনপ্রিয় বিষয়ে নিবন্ধ, পাঠকদের চিঠি, বিজ্ঞাপন, নানা কৌতুহলপ্রদ ব্যাপারসমূহ, ইত্যাদি। এবং আমি বলতে পারি যে, জনপ্রিয় লিখন ও বাচনের 'কোড' গুলির উপরে ভাপৎসারভ পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। 'বলা যাক', 'যেমনটি তাঁরা বলতে চান', 'ব্যাপারটিকে একটু জিরোতে দিন' প্রভৃতি শব্দবন্ধ তাঁর লেখায় একেবারে স্বাভাবিক, জৈব শোনায়।

যদি আমি আমার বালক বয়সের পাঠের অপাপবিদ্ধ অভিজ্ঞতায় ফিরে যাই, তবে ভাপৎসারভের আপনার সঙ্গে ('সঙ্গে', 'প্রতি' নয়) কথা বলার ভঙ্গিটিকে বিশেষভাবে সম্মোহক মনে হয়। একটি কবিতায় ('বিশ্বাস') ব্যবহৃত কথোপকথনময়তা, বহুধ্বনিময়তা, আলংকারিক নৈপুণ্য, বিভিন্ন, এমনকি বাচনের অসম্পূর্ণ স্তরেরও, ব্যবহার যা আছে, তা প্রকৃতপক্ষে তাঁর সামগ্রিক রীতির একান্তই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। অন্য একটি দিক হলো প্রচলিত গীতিকবিতার ধর্ম নিয়ে অবিরত প্রশ্ন তোলা ঃ

'... কবিতা, যা আমরা লিখি,
হলো বিষাদাক্রান্ত ও সংক্ষিপ্ত।
সুগন্ধবহ নয়, উজ্জ্বলও নয়।'
('ইতিহাস')

গীতিকবিতার ক্লিশেগুলির প্রতি শ্লেষ ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষত 'মেছোদের জীবন', 'রোমান্স' এবং 'না, এটি কবিতা লেখার সময় নয়'-এ। এ হলো শব্দকোষে একটি নতুন স্তরের অনুপ্রবেশের ব্যাপার যার সঙ্গে বুলগেরিয় সাহিত্য এতাবৎ পরিচিত ছিল না, অথবা যা অন্ততপক্ষে তার প্রতিভূস্থানীয় ছিল না। নতুন শব্দগুলি এসেছিল শ্রমিক এবং যন্ত্রকুশলীদের বুলি থেকে (যন্ত্রকুশলী হিসাবে ভাপৎসারভের জীবন স্মরণ করুন) — কবিতায় এইভাবে এসে গেল অকাব্যিক সব শব্দ ও যন্ত্রের নাম ঃ 'লেদ', 'তিনশো বল্টু' ('একটি স্বপ্ন'), 'পাওয়ার লাইন', 'কেব্‌ল্' ('আমরা একটি কারখানা বানাবো'), 'রেল-ইঞ্জিন' ('আমাদের সময়'), 'কনক্রিটের বনেদ' ('ভয় পেয়ো না, বাচ্চারা')....

শব্দ-ব্যবহার ও রীতিপ্রকরণের অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো সমসাময়িকতার 'মিথতত্ত্ব' যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছে বিজ্ঞাপনী ব্র্যাণ্ড ও নামগুলি। বিজ্ঞাপন এবং প্রোপাগাণ্ডার ধারণা বা কোনো একটি বিশেষ ব্র্যাণ্ড বা 'কর্পোরেট হাউসে'র নামের ব্যবহার ১৯৪০-এর দশকের কবিতার অন্যতম 'ট্রেডমার্ক'। যদিও ভাপৎসারভে এ জাতীয় ব্যবহার সীমিত, 'কাহিনি'-তে তিনটি মুখ্য সমরাস্ত্র-কারখানার উল্লেখ আছে ঃ ক্রুপ্‌স্, বেয়ার্স ও ভাইকার্স।

আলোচনাটি শেষ করার আগে ভাপৎসারভ কর্তৃক উল্লেখিত স্থান-নামগুলির কথাও বলা দরকার। এগুলি হলো ভৌগোলিক নাম, ১৯৪০-এর দশকে যেগুলি কবিতার দিগন্তকে দূরবর্তী ও বিচিত্র সব দেশে প্রসারিত করে। সিনেমায় দেখা, রেডিয়োতে শোনা, বিভিন্ন জনপ্রিয় সাহিত্য ও স্কেচ-সমন্বিত ম্যাগাজিনগুলির মাধ্যমে কল্পনা-করা বিষয়গুলি রাজনৈতিক পাঠ্যমূলেও ঢুকে পড়লো। যখন আমরা দাবি করি যে ১৯৪০ এর দশকের কবিতার লক্ষ্য বাস্তবতা ও পৃথিবীর দৃশ্যমানতা (এবং এগুলিই হলো সাধারণ ও প্রশ্নাতীত 'লেবেল'), তখন আমাদের স্মরণ করতেই হয় যে যাকে আমরা 'বাস্তবতা' ও 'দৃশ্যমানতা' বলি তা অনেকাংশেই মিডিয়ার সৃষ্টি। ভাপৎসারভের কবিতায় যে সমস্ত বিদেশী ভৌগোলিক নাম পাওয়া যায় তার কিছু হলো ঃ প্যারী, টেক্সাস, আলজেরিয়া, ফিলিপাইনস্, ফ্যামাগুস্তা, মাদ্রিদ, টোলেডো, ল্যাঙ্কাশায়ার, স্পেন, ককেসাস, উরাল, মেক্সিকো, রাশিয়া, চীন, ইউক্রেইন ও সাইরেনেসিয়া। এই সমস্ত মূর্ত ও বিশেষ ভৌগোলিক স্থানসমূহ তৎসহ ট্রেডমার্ক ও টেকনিকাল শব্দের ব্যবহার কবিতাকে ডকুমেন্টারি এবং রিপোর্তাজের প্রান্তে নিয়ে যায়।

সাধারণত ভাপৎসারভের খণ্ডগুলির ভূমিকা শেষ করা হয় তাঁর শেষ দুটি কবিতার আলোচনা দিয়ে, সেই দুটি কবিতা যা তিনি তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে লিখেছিলেন। আমি চাচ্ছি 'ইতিহাস' কবিতাটি দিয়ে শেষ করতে, কারণ এখানে আমরা দেখি ব্যক্তিক কষ্টভোগের একটি গভীর ও ট্রাজিক সংঘর্ষ, শীতল ও নীরব অনন্তের সঙ্গে এক 'ক্ষুদ্র মানবিক নাটক'। 'ইতিহাস' হলো ভাপৎসারভের সবচেয়ে নাটকীয় ও ব্যক্তিক রচনাগুলির অন্যতম। এটি তাঁর কবিতার সর্বোচ্চ স্তরের অংশ এবং বহু আলোচিত। কেন্দ্রীয় সমস্যাটি হলো কিভাবে একজন অজ্ঞাতনামা ও দৈনন্দিন জীবনে অতি সাধারণ পুরুষ বা মহিলা ইতিহাসে প্রবেশ করতে পারে। কিভাবে তাঁরা, যাঁরা ইতিহাসের দূর প্রান্তে বসবাস করেন, যাঁরা মিডিয়ার দূর প্রান্তে বসবাস করেন, যাঁদের ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ, প্রচারপত্র, নিউজরীল ইত্যাদিতে কখনও দেখা যায় না, এবং যাঁরা স্রেফ পাঠক, শ্রোতা এবং দর্শক ('শেষ ইস্তাহারের পরে/আমরা যাচ্ছি মধ্যরাতের বিছানায়')—তাঁদের স্থানটুকু পেতে পারেন। ইতিহাস কি তাঁদের দিকে সামান্যতম দৃষ্টিও দেবে, ইতিহাসের স্মৃতিপটে তাঁদের কি সামান্য চিহ্নও থাকবে, নাকি ইতিহাস 'শুধুমাত্র প্রান্তীয় রূপরেখাটিকেই ধরবে', ভাপৎসারভের নায়ক সরাসরি এবং মুখোমুখি ইতিহাসকে এই প্রশ্ন করেন এবং তা এই তথ্য জেনেই যে তিনি ইতিহাসকে নিজের রক্ত ও মাংস খাওয়ান। এছাড়া, যা কিছু লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, যা কিছু নষ্টযোগ্য, বস্তুর সেই অনিত্যতা-বিষয়ক কবিতা হলো 'ইতিহাস', এবং তা আরও সেইসব বিষয়ে, 'গ্র্যাণ্ড ন্যারেটিভে' গৃহীত ও ধৃত হওয়ার আগেই যেগুলি মৃত হয়ে যায় ('আমরা শরতের মাছির মতো নষ্ট হয়ে যাই')। 'ইতিহাস' কবিতাটিতে ভাপৎসারভ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো মোহ পোষণ না করে, পরিষ্কার দেখছেন কি আসছে ঃ

'সন্দেহ নেই যে তাঁদের পুস্তিকা ও কাজকর্ম নিয়ে
কবিরা ব্যস্ত থাকবেন
এবং আমাদের অলিখিত দুর্দশাগুলি
শূন্য বাতাসে ভাসতে থাকবে।'

এ হলো বুলগেরিয় কাব্যক্ষেত্রের সবচেয়ে তিক্ত ও নির্মম, এবং একই সঙ্গে সবচেয়ে সান্ত্বনাদায়ী রচনা। শেষে, 'বিদায় সঙ্গীত'-এ ভাপৎসারভ মনশ্চক্ষে দেখেন 'অপ্রত্যাশিত অতিথি'-কে—করুণতম প্রেমের কবিতা, প্রেমরহিত, এবং পোকাগুলি 'সংগ্রাম নির্মমভাবে কঠিন' কবিতায় .... অস্বীকার করা চলে না যে এই কবিতাগুলিই উপসংহার, কিন্তু 'ইতিহাস'-এ এসবকিছু আগেই দেখা হয়ে গেছে শুধু নয়, এসবের মধ্যে বসবাসও হয়ে গেছে। এই কবিতার পরে শুধুমাত্র বিপ্লবী আশাবাদের দৃষ্টিতে ভাপৎসারভকে সোজা-সরল পদ্ধতিতে পাঠ করা অসংগত এবং অতিসরলীকৃত বলে মনে হয়।

কারাকক্ষে, জীবনের শেষ কয়েকটি মাসে ভাপৎসারভ তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন স্মৃতি থেকে তাঁর শেষ কটি কবিতা লিখতে যেন সেইসব 'অলিখিত দুর্দশাগুলি' কমাতে, অন্যথা যেগুলি 'শূন্য বাতাসে ভেসে থাকতো।'

বাকিটুকু ইতিহাস।

---

* ***গিয়োর্গি গসপডিনভ*** *একজন বুলগেরিয় কবি ও উপন্যাসিক, তার লেখা নানা ভাষায় অনুবাদও হয়েছে। তিনি সোফিয়ার সাহিত্য ও সংস্কৃতির মুখপত্র Literaturam Vestnik সম্পাদনা করছেন। ভাপৎসারভের কবিতার উপর তার আলোচনা গ্রন্থ Poetry & Media ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে।*

নিকোলা ভাপৎসারভের কবিতা

কিনো

বাইরে, কোলাহল,
ঝলমলে বিজ্ঞাপন
এবং পোস্টারগুলি ঘোষণা করছে
একটি মানবিক নাটক
বাইরে, কোলাহল,
আমার ঘামতে থাকা মুঠিতে
পিষে ধরা টাকা।

আলোগুলি ঝাপসা হয়
এবং সাদা আয়তক্ষেত্রে
মেট্রো গোল্ডউইন সিংহ
হাই তুলতে তুলতে আড় ভাঙে।
হঠাৎ—
একটি হাইওয়ে,
তারপরে একটি জঙ্গল,
এবং পিছনে
আকাশ, অতি বিপুলভাবে নীল।

হাইওয়ের একটি বাঁকে
দুটি ফ্যান্সি লিমুজিন
মুখোমুখি
আমাদের নায়ককে 'হেল্লো' বলুন
এবং নায়িকাকেও।

সংঘর্ষের পরে
শ্বাসরুদ্ধ মেয়েটি চাকার পিছনে
ইস্পাতের দুটি বাহুর মাঝে,
মেয়েটি চোখ খুলল,
তাকালো।
এ্যাতো উজ্জ্বল, সাঁতার-কাটা চোখ!
কি দারুণ মেয়ে, সাঙাৎ!
কি দারুণ বংশের ঘোটকী!
বলা বাহুল্য গাছগুলিতে
একটি নাইটিংগেল পাখি আছে,
মৃদু বৃষ্টি হচ্ছে,
নরম এবং সবুজ, রেলিংয়ের ওধারে,
অপেক্ষা করছে ঘাস,
লুব্ধভাবে।

আবছা ফোকাস-পাওয়া জন
আগ্রাসী চুমু খচ্ছে গ্রেটাকে
লুব্ধ শিশুর লালা তার ঠোঁটে।
যথেষ্ট!
এতে আমাদের কী করার আছে?
নাটকটা কোথায়?
এসবে আমি কোথায়? বলো?
এই বিস্ফোরক সময়ের গুলিভরা বন্দুকগুলি
আমাদের মনের বিপরীতে উদ্যত রয়েছে।

এমন অকপট নির্মলতা নিয়ে
আমরা কীভাবে ভালোবাসতে ও কষ্ট পেতে পারি?
আমাদের পাঁজর-ভর্তি ধোঁয়া
আমাদের ফুসফুসে অজস্র গুলি-লাগা ফোঁকর।

এইভাবে,
লিমুজিনে বসে,
আমরা কি সত্যিই মিলিত হতে পারি?
আমাদের পাঁজর-ভর্তি ধোঁয়া
আমাদের ফুসফুসে অজস্র গুলি-লাগা ফোঁকর।

এইভাবে,
লিমুজিনে বসে,
আমরা কি সত্যিই মিলিত হতে পারি?
আমাদের ভালোবাসার জন্ম
শ্রমে,
ধোঁয়া, ঝুল
আর মেশিনরাশির
মাঝে।

তার পরে — ধূসর জীবন,
রুটির জন্যে লড়াই,
ভাসা-ভাসা স্বপ্ন,
আর রাতে সংকীর্ণ বিছানায়—
যেখানে আমরা অলক্ষ্যে বিলীন হয়ে যাই।
এই-ই হলো প্রকৃত মানবিক নাটক,
এই-ই আমাদের দশা,
বাকি সব—
মিথ্যা।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ

আমরা পুরোদমে মোকাবিলায় নেমেছি,
আমরা হাতে হাতে লড়ছি,
তুমি ভেঙে পড়ছো, আমার
বুক থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। এখন কি হবে?
আমাদের মধ্যে একজন মার খাবে,
আমাদের মধ্যে একজন হারবে—
আর হেরে যাওয়া লোকটি হলে তুমি।

আমাকে বিশ্বাস করছো না? ভয় পাচ্ছো না?
আমি কিন্তু মনে মনে প্রতিটি পদক্ষেপ ভেবে নিয়েছি,

আমি আমার সমস্ত শক্তি একত্র করেছি,
এবং তুমিই হবে সেই লোক যার পতন হবে,
তুমি—পচা এবং তিক্ত জীবন।

এই-ই প্রথম নয়, প্রথম কি?
আমরা আগেও এখানে ছিলাম,
তুমি আর আমি বছরের পর বছর ধরে লড়ছি,
হাতে হাতে
আমি এখনও অনুভব করতে পারি
তুমি কিভাবে আমার কব্জি মুচড়ে ধরেছিলে,
তোমার নির্মম, পাশব মুষ্টিতে।

মাটির তলায় গ্যাস বিস্ফোরণ—
কয়লার স্তরের জোন ধসে পড়েছে
পনেরটি
দেহ
খনির নীচে।
তাদের মধ্যে একটি
ছিল
আমার।

কোনো এক বস্তির দোরগোড়ায়
একটি ধোঁয়া-ওঠা
বন্দুক
মাটিতে পড়ে আছে।
দেহটা ক্রমে নিথর হচ্ছে....
কোনো আর্তনাদ নয়,
কোনো শব্দ নয়—
স্রেফ একটা শট্,
ট্র্যাশ্।
কতো সহজে...
লড়াই ছাড়া,
বাঁচার ইচ্ছা ছাড়া,
কোনো কণ্ঠস্বর ছাড়া।
তোমার মনে পড়ে
সে কে?
তুমি দেখতে পাচ্ছো না...
সে
ছিল
আমি।

লোকটার পিঠে গুলি লেগেছিল
এখন সে রক্তেভেজা মাটিতে পড়ে আছে,
বিস্ফোরণের জন্যে তৈরী, আকাশটা
ভেঙে পড়বে মোড়ের মাথায়,
লোকটা পড়ে আছে
ওখানে
থিকথিকে রক্তের স্রোতে,
আমার ভাই
ভালোবাসা আর ঘৃণা জ্বলছে
তার ধোঁয়াটে
দৃষ্টিতে।

হত্যাকারী
তার ঘৃণিত পদচিহ্ন
চকিতে ঢেকে ফেললো।
আন্দাজ করতে পারো
ঐ ইঁদুরটা কে ছিল?
হ্যাঁ—
বুঝেছ
ওটা ছিল
আমি...
কিন্তু তোমার কি মনে পড়ে সেই বাচ্চাটার কথা
প্যারীর ব্যারিকেডে যে মারা পড়েছিল?
একটা বাচ্চা
যে যা কিছু নোংরা ও হীন তার বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে
ব্যারিকেডে খুন হয়ে গেল, তার কথা?
তার রক্ত
ঠাণ্ডা হচ্ছে
বেয়নেটের মতো।
এক সেকেণ্ডের জন্যে
স্মিত হাসি দেখা দিল তার ঠোঁটে।
তারপরে তা নীল হয়ে গেল,
তবু তার দুচোখে
একটি শিখা
এখনো জ্বলছে
যেন তার চোখদুটি গেয়ে চলেছে
'স্বাধীনতার জয় হোক...'

ঐ কচি বাচ্চাটাকে
গুলি করা হয়েছে,
সে এখন রয়েছে মৃত্যুর ঠাণ্ডা হাতগুলির মাঝে—
আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি
ঐ সুন্দর ফুলটি ছিলাম আমি!

কিন্তু তোমার কি মনে পড়ে
একটি মোটরগাড়ির কথা,
যেটি আশাবাদে
অট্টহাসি হাসতে হাসতে
এমন নিবিড় কুয়াশার
মধ্য দিয়ে ছুটে যেত
যেখানে পাখিরাও
যেতে সাহস পায় না?
একটি ডানাঅলা ইঞ্জিন
যা বরফ শীতল আবরণ কেটে ধেয়ে যাচ্ছে,
পাল্টে দিচ্ছে পৃথিবীর অক্ষপথ,
পেট্রোলের ঝাপটা আর ধোঁয়ার রেখায়
সাফ করছে প্রগতির পথ?

ঐ মোটরটি যেটি মাথার উপরে গান করছে
সেটি আমার তৈরী
এবং মোটরের গানেই
আমার হৃদয় রক্তাক্ত হয়।

সেই লোকটি যার সদাসতর্ক দৃষ্টি
স্থির হয়ে আছে
স্নায়বিক পরিধির দিকে,,
সেই লোকটি যে কুয়াশা আর
উত্তরা বায়ুর তুষারের বিরুদ্ধে লড়েছে—
তোমার কি মনে পড়ে
তাকে?
সে হলো
আমি।

আমি এখানে
এবং সেখানে,
সর্বত্র।
টেক্সাসের শ্রমিক
আলজেরিয়ার জাহাজঘাটার কুলি
একজন কবি....
এবং আরও অনেক কিছু!

তুমি কি ভাবছো—
তুমি জিতবে?
তুমি জ্যালজ্যালে, তেলচিটে
কদর্য জীবন?

আমি আগুনের উপরে
এবং তুমিও আগুনের উপরে,
আমরা দুজনেই ঘর্মাক্ত
কিন্তু তুমি শক্তি হারাচ্ছো
তুমি ক্রমেই দুর্বল হচ্ছো
লড়াই ছেড়ে দাও।
তোমার দম ফুরিয়ে গেছে,
তোমার মুষ্টি আলগা হচ্ছে
তুমি মৃত্যুর ভয় পাচ্ছো।
তাহলে বরং এসো
নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ের বদলে
যা প্রয়োজন তা সৃষ্টি করতে
একসাথে কাজ করি—
একটি অন্য রকমের জীবন,
জরুরী
মুক্ত
এবং কাঙ্ক্ষিত—
আহা! কি দারুন দিনই না সেটা হবে?

অনুবাদ ঃ শম্ভু ভট্টাচার্য

দেশ

এই দেশ,
আমার পায়ের নীচে
বসন্তের বাতাসে কেঁপে ওঠা
এই দেশ,
ক্ষমা করো,
এই দেশ, এ আমার দেশ নয়
আমার নিজের দেশে
আমি পরবাসী একজন।
যাত্রা শুরু করেছিলাম সকালে।
প্ল্যান্টের দিকের রাস্তা
ভিড়াক্রান্ত
অগুন্তি মানুষের জটলায়।
আমাদের একই হৃদয়
এতটাই আমাদের মন
তবু
মনে হয় না আমি এখানকারই কেউ।
আমার দেশের উপর
নেমে আসে
সূর্যালোক
রোদের ঝর্না
ঝাঁপিয়ে পড়ে
আমার মাটিতে।
যখন দেখি
ফুটে উঠেছে কত না ফুল
আমার গভীরে
স্পন্দিত হয়
আমার দেশের হৃদয়।
আমার দেশের উপরে
পিরিন[১] ধরে রেখেছে আকাশকে
ঝোড়ো বাতাসে শাদা ফার গাছগুলো
গেয়ে শোনায় সেন্ট এলিজা দিবসের
অভ্যুত্থানের কথা,
আর অহ্রিদ[২]-এর উপর
বিশাল আকাশ ছড়িয়ে রাখে তার নীলিমা
যতক্ষণ না তুমি দেখতে পাও
ঈজিয়ান[৩] সাগরের জ্বলন্ত বেলাভূমি।
আমাকে শুধু মনে রাখতে হবে সব
আর আমার হৃদয়
হয়ে ওঠে কোমল...
আমার দেশ! আমার রূপসী দেশ!
রক্তে ভাসা আর বিদ্রোহে উদ্দাম
আর বেলাসিট্‌সা[৪] পাহাড়ের উপর, উঁচু হয়ে উঠছে
কাঁটাতারের বেড়া...

অনুবাদকের টিকা ঃ

[১]পিরিন—বুলগেরিয়া-র দক্ষিণ-পশ্চিমে, উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ৪০ কিলোমিটার বিস্তৃত পর্বতমালা, প্রস্থে ২৫ কিলোমিটার। বুলগেরিয়া-র দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ও ইওরোপের অষ্টম সর্বোচ্চ পর্বতমালা।

[২]অহ্রদ—বুলগেরিয়া-র পশ্চিমে, ম্যাসিডোনিয়ার অন্তর্গত অহ্রদ হ্রদ ও অহ্রদ শহর। ম্যাসিডোনিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এই হ্রদ ও জনপদ ইওরোপের প্রাচীনতম জনপদের একটি। এটি ইউনেস্কো-র 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ; তালিকাভুক্ত। স্লাভ সংস্কৃতির সঙ্গে এই অঞ্চলের অবিচ্ছেদ্য যোগ।

[৩]ঈজিয়ান—৬১২ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ২৯৯ কিলোমিটার চওড়া এই সমুদ্রটি ভূমধ্য সাগরের এক উপসাগর। এটি দার্দানেলেস প্রণালী ও বসফরাস প্রণালী দিয়ে যথাক্রমে মারমারা সাগর ও ব্ল্যাক সী-র সংগে যুক্ত। এর পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে গ্রিস এবং পূর্ব ও উত্তর-পূর্বে তুরস্ক। বুল্গেরিয়া-র সঙ্গে এই সাগরের কোনো ভৌগোলিক যোগ নেই, তবে সাংস্কৃতিক যোগ আছে। বুলগেরিয়ায়, স্লাভ ভাষায় এই সাগরকে বলা হয় 'শ্বেত সমুদ্র'।

[৪]বেলাসিট্সা—৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৭ থেকে ৯ কিলোমিটার চওড়া এই পর্বতমালা উত্তর-পশ্চিম গ্রিস, দক্ষিণ-পূর্ব ম্যাসিডোনিয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিম বুলগেরিয়া-র মধ্যে অবস্থিত।

চিঠি

মনে পড়ে
সমুদ্র আর মেশিনগুলোর কথা,
থকথকে গোধূলির আলোআঁধারিতে ভরা
গর্তগুলোর কথা?
আর ফিলিপাইনসের দিকে আমাদের সেই যাত্রা,
আর ফারমাগুসটার সেই বিশাল তারাগুলো?
এমন কোনো নাবিক কি আছে
দূরের গোধূলির দিকে যে কখনও
মেলে দেয়নি তার স্বপ্নাতুর আঁখি
রাতে অনুভব করেনি গ্রীষ্মমণ্ডলের হাওয়া?
মনে পড়ে কীভাবে
এক সময়
আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম
আমাদের আশা
আর সব বিশ্বাস
মানুষের উপর
কল্যাণবোধে,
রোম্যান্টিক যা-কিছুতে
আর ফাঁপা স্বপ্নে?
মনে পড়ে কীভাবে
খুব তাড়াতাড়ি, খুবই তাড়াতাড়ি,
আমরা আটকা পড়েছিলাম জীবনের কুটিল ফাঁদে?
বড়ো দেরিতে
আমরা ফিরে পেয়েছিলাম আমাদের চেতনা।
দেখলাম আমরা ভালো ভাবেই বাঁধা,
খাঁচায় আটকানো জন্তু,
আমাদের চোখ
দপদপ করছে
আর কী যেন চাইছে,
আর মাগছে দয়া।
আমরা ছিলাম তরুণ,
কী অল্প ছিল আমাদের বয়স!
আর তারপর—আর তারপর
একটা ঘৃণা
গ্রাস করল আমাদের হৃদয়।
গ্যাংরিনের মতো,
না, কুষ্ঠের মতো,
আর তা ছড়িয়ে পড়ল
পচিয়ে দিল আমাদের হৃদয়
তা আমাদের আটকে ফেলল
তার শূন্যতা
আর অন্ধকার হতাশার
নিষ্ঠুর ফাঁদে।
তা আস্তে আস্তে মিশে গেল আমাদের রক্তে
আর আর্তনাদ করে উঠল
আর এসবই হলো বড়ো তাড়াতাড়ি, খুব দ্রুত...

আমাদের অনেক উপরে,
অনেক উঁচুতে আকাশে
চিলেদের ডানা
তখনও ভাসছিল অলৌকিক,
আকাশ তখনও ঝকঝক করছিল যেন অভ্র-মাখা
আর তা তখনও ছিল
চিরদিনের মতোই বিশাল আর সুনীল
আর প্রতি সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে
জাহাজগুলোর বয়ে-চলা হারিয়ে যাচ্ছিল
আমাদের দৃষ্টি থেকে
আর মাস্তুলগুলো মিলিয়ে যাচ্ছিল কুয়াশায়।
কিন্তু আমরা ছিলাম অন্ধ।
আমার কাছে এ সবই অতীত, আর ফালতু।
কিন্তু তুমি আর আমি
আমরা ভাগ করে নিয়েছিলাম জাহাজের একই বার্থ
তাই তোমাকে বলা দরকার
আমার আজকের বিশ্বাসের কথা, আর ভাগ করা উচিত আমার আনন্দ
এই সেই বিশ্বাস
যা আমাকে আটকেছে
আমার মাথার মধ্যে
একটা বুলেট পুরে দেওয়া থেকে
এ সেই বিশ্বাস
যা বদলে দেয় ঘৃণাকে
সংগ্রামে,
যা
আজ
প্রবল রাগে ফেটে পড়ছে।
আর সেই আমাদের ফিরিয়ে দেবে ফিলিপাইনস,
ফারমাগুসটার বিশাল তারাগুলো,
আমাদের হৃদয়ে ঠাণ্ডা মেরে-যাওয়া

আশা

আর মেশিনগুলোর জন্য আমাদের মরে-যাওয়া ভালোবাসা,
বিশাল সমুদ্রের অন্তহীন নীলিমা
গ্রীষ্মমণ্ডলের শান্ত হাওয়া।
এখন রাত্রি।
মোটরগুলো
গুনগুন করছে ছন্দে
আর বাঁচিয়ে রাখছে আমার বিশ্বাস।
ওঃ কী ভালোই না বাসি জীবনকে!
তাই আমি ঘেন্না করি
বোকা বোকা বিভ্রমকে।

নিশ্চিত জানি ভোর আসবেই
আমরা ভাঙব সব জড়তা
কিন্তু তখন সূর্য—
আমাদের
উজ্জ্বল
সূর্য—
ঝলসে উঠবে
অন্ধকার দিগন্তের উপর
আর তা ঝল্‌সে দেবে
ছোট্টো প্রজাপতির মতো
আমার ডানা
আমি অভিসম্পাত দেব না
দোষ দেব না আমার ভাগ্যকে
কারণ আমি জানি
মরতে হবে আমাদের সবাইকেই
কিন্তু পৃথিবী যেমন
ঝেড়ে ফেলছে
তার যুগ-যুগান্তের বিষ
যখন নতুন জন্ম হচ্ছে লক্ষ লক্ষ,
মরি যেন তারই জন্য—
এই হলো গান
হ্যাঁ, এটাই হলো এক গান।

অনুবাদ ঃ সব্যসাচী দেব

একটি প্রেমের গান

ভবিষ্যৎ আছে ঝুলে মাথার আকাশে
জমাট চাঙর যেন, পতনে উন্মুখ—
আমাদের হৃদি পূর্ণ আগুনে ও ত্রাসে
যুদ্ধও আসছে শীঘ্র কেড়ে নিতে সুখ।

এই দৃশ্য সদা দেখি যদি নিরীক্ষণে
স্পষ্ট হয় ঊর্দ্ধগামী চিমনি কারখানার—
সে দৃশ্য দেখায় সূর্য অন্তিম কিরণে
আর নীল, শান্তিময় আকাশের ডানা!

কঠিন সময়ে যেন বোলো না একথা
যখন গ্রন্থিত আমরা অঙ্গুরীর টানে—
এও এক ভ্রম, জেনো, প্রাণের সোঁতায়
কোথায় রেখেছি ঠাঁই, প্রেম স্ফূর্ত গানে।

সমস্ত ক্রিয়ার মধ্যে অক্লান্ত ঘর্ঘর,
যুদ্ধের অশুভ আর্তি, সংগীতে দামামা—
বোলো না আমাকে, এও ভ্রান্তির দোসর,
আমি যা ভাবছি : 'তাকে এ-প্রেম আমার।'

এ-ও সত্য, ভালবাসা ছোট্ট এক দেশ
প্রেম দাবি করে সীমায়িত দৃশ্যলোক
সম্মুখে তাকাই তাই — আর শেষমেশ
লিখছি তোমার জন্য ছোট্ট এই শ্লোক।

স্পেন

কি বলতে চেয়েছিলে আমাকে তুমি?
কিচ্ছু না।
নাইটদের ও দূর পাহাড়ের অন্য এক
ঈশ্বর-ত্যক্ত ভূমি।
আমার কাছে তুমি কি ছিলে?
একটা ঠাঁই
নৃশংসতা ও ভয়ংকর ভালবাসার
উন্মাদমাতাল রক্তপানে,
বিচ্ছুরিত ব্লেডে,
গানে ও গীটারে,
আবেগে,
ঈর্ষায়
এবং ধর্মসংগীতে।

অথচ এখন তুমি নিয়তি আমার
এখন তোমাকে আমি জড়িয়েছি প্রাণে—
আমার জীবন, আজ, তীব্র অংশীদার
স্বাধীনতাযুদ্ধহেতু তোমার অঘ্রাণে।

এখন আনন্দ করি, আর রক্তিমতা
পেয়ে হেঁটে পার হই বিজয়ের সেতু—
কেবল আমার শক্তি তোমাতে বহতা
আমি তো বিশ্বাস রাখি তরতাজা হেতু।

সাদামাটা, নীল জামা, কে এক শ্রমিক
শায়িত আমার পাশে। সে এখন শব।
টুপির নিচের রক্তে ভাসে চারদিক—
অবিশ্রান্ত, উষ্ণ, লাল : নিঃশব্দ, নীরব।

এ রক্ত গর্জায় এত, শিরা নয়ছয়।
আমি জানি, যে শ্রমিক শুয়েছে ধুলোয়
স্পেনে যুদ্ধে যোগ দিতে আসার সময়
ল্যাঙ্কাশায়ারে সে আঁচ দিয়েছে চুলোয়।

কেননা সে আর, আমি একসাথে কাজ
ফার্নেসচুল্লীতে করে ঠেলেছিনু কাঠ—
আমাদের একই তৃষ্ণা : ঢিলে বা দরাজ
হবো না কখনও, যদি না খুলি কপাট।

ওগো নিদ্রা, প্রিয় সখা, স্বপ্ন শান্তিময়:
রক্তমাখা নিশানের নিচে পুরো মোড়া;
তোমার আমার রক্তে একই স্রোত বয়—
পৃথিবীর সব খেত ভাসবে ঝোরা-য়!

স্থান থেকে স্থানান্তরে বন্যা বহমান—
বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে, প্রত্যাশাপূর্তির
বন্যায় মথিত হবে সেইসব প্রাণ
অনুভব করেছিল যারা রক্তে দ্রুতি।

রেখেছি চির-অদম্য আশা ও বিশ্বাস
একদিন করব শেষ এই মহারণ:
নির্মম ও অহেতুক, দুর্ভাগ্যের দাস—
তা' ছিল মুক্তির হেতু, রক্তাক্ত কারণ।

এটাই তুলছে, আজ, প্রতিবন্ধকতা—
সম্পূর্ণ করেছে শিরা নবলব্ধ জিদ
এবং চিৎকারে পরিবাহিত হর্ষতা:
'মাদ্রিদ্র আমাদের, আমাদেরই মাদ্রিদ্র।'

ও মানুষ, সাহস সঞ্চয় করো। পৃথিবী আমাদের!
এবং প্রতিটি ক্ষুদ্র পরমাণুখণ্ড
আমার এবং তোমাদের।
দক্ষিণ আকাশের নিচে
নিদ্রা যাও
এবং বিশ্বাস রাখো
আমাদের শৌর্যে!

অনুবাদ : বিশ্বনাথ গরাই

আমরা তৈরি করবো একটা কারখানা

আমরা তৈরি করবো
শক্তপোক্ত কংক্রিটের দেওয়াল ঘেরা
বিশাল একটা কারখানা।
নারী পুরুষ জনসাধারণ
সবাই মিলে
আমরা তৈরি করবো
জীবনের একটা কারখানা।

বিষাক্ত দুর্গন্ধময়
আলোহীন ঝুপড়ির মধ্যে
মারা যায় আমাদের শিশুরা।
পৃথিবীটাই একটা জেলখানা!

নারী পুরুষ জনসাধারণ-আমরা
আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হতে দিতে পারি না।
আমরা তৈরি করবো
জীবনের একটা কারখানা।
আমাদের শিশুরা মারা যায়
দুর্গন্ধময় ঝুপড়ির মধ্যে,
তাদের চোখ আলোর খিদে!

আর আমরা?
ভয়েই স্থবির,
নির্লজ্জ, শুধু তাকিয়ে দেখছি,
আর চুপ করে আছি।
যদিও অসংখ্য বিদ্যুৎবাহী
তারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে
আমাদের পোষমানা রক্ত,
হ্যাঁ, আমাদের রক্ত বইছে
কেবেল লাইনগুলোর মধ্যে দিয়ে
যাতে সবকিছু মসৃণভাবে চলে আর
ভাসিয়ে নিয়ে যায় আমাদের।
আমরা চেয়ে চেয়ে দেখি বোবা, নির্বোধ
অসহায় শিকারের মতো।
আমরা আমাদের নখ দিয়ে পাথর আর গ্রানাইটের মধ্যে টানেল খুঁড়ি,
মাটির উপরে আমরা বসাই ট্রেনলাইন, তার জন্য
সব খনিজ সম্পদ সংগ্রহ করি।
আকাশে বিমান চলাচল করে, আর নীচে কুয়াশায়
আটকে পড়া আকাশচুম্বী অট্টালিকাসমূহ,
তারও অনেক উপরে গর্জনরত ইস্পাতের সিংহগুলো—

কমরেড, আমাকে ভুল বুঝবেন না,
আমি আদৌ প্রগতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না,
আমি সব সময় এটা জানতাম।
এটা ঠিক নয় যে প্রগতি আমাদের শ্বাসরুদ্ধ করে,
এটা ঠিক নয় যে প্রগতির গতি প্রতিহত হোক।

আমরা তৈরী করবো
শক্ত পোক্ত কংক্রিটের দেওয়াল ঘেরা
বিশাল একটা কারখানা।
নারী পুরুষ জনসাধারণ
সবাই মিলে
আমরা তৈরী করব
জীবনের একটা কারখানা।

একজন অন্ধ লোক

একজন অন্ধ লোক
চেলো বাজাচ্ছে
স্থানীয় সিনেমা হলে
তোমার মনে হচ্ছে
তুমি যেন শুনতে পাচ্ছো
অন্তহীন এক রুক্ষ প্রান্তরে ছুটে চলা
ঘোড়ার গাড়ীর ঘন্টির শব্দ।
উপরন্তু দেখতে পাচ্ছো
চুম্বনরত নরনারীকে।
বীবরের লোমের কোট পরা,
বরফের আদরের স্পর্শ,
একাকী,
মানুষের কর্কশতা/মলিনতা থেকে বহু দূরে।

ওঃ, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো
কত আলাদা!
পরস্পরের থেকে
কতই না দূরে আমরা!
আমি দেখি : কর্দমাক্ত এক সন্ধ্যা,
দুঃখে ভেঙ্গেচুরে যাওয়া
জনপদ।
আমি জানি
ঐখানে-
প্রত্যেকটি দেওয়াল আর বেড়ার আড়ালে আছে
জীবনের এক ব্রাত্য সন্তান!

অন্তিম স্বরগুলি মিলিয়ে যায়
অর্ধস্বরে, তার আবেশে বাঁধা
পড়ে যাও তুমি।
তুমি বুঝতে পারো না
এই শান্তি বাস্তব নয়।
আমার অসহ্য লাগে-
তোমার ফাঁপা দুঃখ,
এক মৃত্যুপথযাত্রী স্পেনীয় নাইটের জন্য
নাকে কান্না!
সমস্ত পৃথিবী যখন কেন্দ্রীয় কিছু নতুন ধ্যানধারণার চাপে
ক্রমশঃ ক্ষয়ে যাচ্ছে;
যখন সাদা বরফে ঢাকা সমতল
ধুয়ে যাচ্ছে বসন্তবাতাসে,
বাতাস কেটে ছুটে যাচ্ছে
দ্রুতগামী ট্রেন, ট্রেনভর্তি নতুন লোকজন,
তারা ককেসাস বা উরাল থেকে সূর্য নিয়ে আসছে,
অথচ এই সমতলে কোথাও
শোকের লেশমাত্র নেই।

শুধু কান পাতো,
মুখ মুছে নাও এই নতুন ধারার ঐক্যতানিক প্রবাহে,
দেখো, বিস্তারিত পৃথিবী!
পৃথিবী রয়েছে এখানে, তোমার আমার মধ্যে,
আর এই ভীড়ে,
যাকে মুখহীন বলে মনে হয়-
আমি এই ভীড়কেই ভালোবাসি,
কারণ ও সামনে নতুন দিনের দিকে চলমান,
কারণ ও লড়াই করে।

অনুবাদ : অনিন্দ্য চাকী

এক মৎসজীবী জীবন

তোমরা (খালিচোখে) দেখো তরঙ্গায়িত
পালতোলা ডিঙি;
(দেখো) আকাশেতে চাঁদ
আর মনে মনে ভাবো
এই তো জীবন
কাব্যে পূর্ণ এক জীবন।

মাথার উপর নক্ষত্র
মহাকাশ দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে
ঝিনুকের মত
মৃদুমন্দ বাতাস আলতো তরঙ্গ তোলে সমুদ্রে।
আহ! গানে গানে প্রশংসিত
কি নিরুদ্বেগ জীবন (মৎসজীবীর)!
মাস্তুলে সাদা পাল তুলে চলে ডিঙি
এমন সব প্রশংসা কতই না সহজ।
আরও বলো 'বিস্তীর্ণ সমুদ্র'
এক টুকরো উদার মুক্ত নীলাকাশ
সব সবকিছুই দেখতে সুন্দর চমৎকার
আনন্দে পূর্ণ।
কিন্তু কেউ কি ভাবে—
দাঁত বসানো সে সব বরফ-ঠাণ্ডা
বাতাসের কথা?
বরফ-ঠাণ্ডা বর্ষার কথা
যা নির্দয়ভাবে আঘাত হানে আমাদের?
প্রবল বর্ষায় হাড় পর্যন্ত ভিজে
তুমি ফিরে আসো ঘরে
শূন্য ডিঙিটা পড়ে থাকে হাঁ করে
শুধুমাত্র দুটি রূপালী মাছ ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে
ডিঙিটার পেছনে অন্ধকারে।
এমন কি স্বয়ং যীশুও যদি
এখন অবতরণ করতেন
কী করতেন তিনি ছোট্ট দু'টি মাছ দিয়ে?
যন্ত্রণায় কষ্টে জ্বলে ওঠে তোমার চোখ
আর তোমার মগজ-মধ্যে ফুঁসে ওঠে ঘেন্না।

নল খাগ্‌ড়ার চালার ভেতর দিয়ে
কুটীর-মধ্যে গড়িয়ে পড়ে বিষ্টি
ঘুমিয়ে পড়ো তুমি
আর তোমার স্বপ্নে
মৃদু আলোর মত হঠাৎ ঝলকানি দেয়
দূর কোন রঙিন আশা।

ওহ্! মৎসজীবীর জীবন (বড়ো) ভয়ঙ্কর!
এক অনিশ্চিত জীবন।
বাঁধা যায় না শব্দ শৃঙ্খলে
শুধুমাত্র কাব্যেই থাক সে জীবন।

অনুবাদ : অবণীভূষণ কাঞ্জিলাল

বিদায়

আমার স্ত্রীর জন্য

প্রায়শঃই আসব আমি তোমার স্বপ্নে নেমে
যখন তুমি থাকবে ঘুমিয়ে দেখব বসে তোমায়
দরজাটা আলগা করে খিলটা রেখ খুলে
তখন রাখব আমি অন্ধকারে আলতো করে
বিছানার পাশে আমার নরম নীরব ঘড়ি
এক অপ্রত্যাশিত অতিথি আমি তোমার ঘরে।
যখন আমার চোখেরা পান করবে তোমার পরিপূর্ণতা।
চুমু খাব, তারপর আবার চলে যাব।

এ সংগ্রাম নির্দয় নিষ্ঠুর

এ সংগ্রাম নির্দয় নিষ্ঠুর
এ সংগ্রাম, যেমনটি বলত লোকে, হচ্ছে এক মহাকাব্য।
আমি পড়ে গেলাম। আর কেউ দখল নেবে আমার জায়গায়।
এটাই সব। একজন লোকের কী এমন গুরুত্ব?
ফায়ারিং স্কোয়াড। তারপর পোকামাকড়
এই তথ্যের কোন ব্যতিক্রম হবে না।
কিন্তু যেই ঝড় উঠবে, আমার জনগণ
ঠিক পাশে এসে দাঁড়াবে তোমার।

এ্যান্টেনা

নীচে ছাদের পর আকাশ রয়েছে ঝুলে,
বাতাসে এরিয়ালের তার দুলছে।
এখানে আমি খবরটা শুনে চিন্তা করতে লাগলাম।
দারুণভাবে রেডিওটি আর আমি আছি জেগে।

রোষভরা এক বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর
আমার বিনিদ্র মগজে ভোঁ ভোঁ করে;
ঐ রকম মদ্দা ভীমরুলের দংশনে বিদ্ধ হয়ে
রেডিও স্টেশনটি আমি বদলে দিই অতঃপর।

তারপর স্যাক্সাফোনের এপাশ থেকে ওপাশে টানাটানি
এক নারীর কৃষ্ণ উরুর উষ্ণতা—
আফ্রিকার প্রশস্ত নিরক্ষীয় রেখার আকাশের নীচে
তবে কি এসবের জন্যেই হয়েছে আমাদের সৃষ্টি করা?
ঝাঁকুনি দেওয়া এক দারুণ তালে
কোন এক জ্যাজ সংগীত বাজছে দারুণ গরমে
ক্যাবারের উদ্দাম নর্তকীরা?
এই কি জীবনের সর্বোচ্চ মানে?

যেন জীবন বইত এক সরল গতিতে
যেমন শান্ত তটজল বয়ে যায় সাগরে!
আমরা বসন্তের দিকে দৌড় দিতে পারি দ্রুত
সেখানে সময় বয়ে যায় অবাধ স্বাধীন গতিতে।

আজ রাত্তিরে স্পষ্ট খবর আমরা শুনি।
বাইরে এরিয়াল নড়ে।
হে মানবজাতি,—কখন তোমাদের স্বপ্ন দেখা বন্ধ হবে,
সমস্ত জগত উঠবে জেগে।

অনুবাদ : জ্যোতির্ময় ঘোষ

আমাদের সময়

যন্ত্র
    ও ইস্পাত
    যন্ত্র
ও তেল
    এবং ময়লা ও ধোঁয়া

আকাশে আকাশে কংক্রিটের চিমনি
বস্তিতে বুভুক্ষ জনতা

মেস্কিকোয় রেল ইঞ্জিনগুলিতে পোড়ে
সোনালী শস্য, যা ক্ষুধার্ত শ্রমিকেরা
জড়ো করেছে দিনরাত ধরে

লিফট গর্জন করে
মোটরগুলি
    আনন্দে
        চূর্ণ করে
            তাদের মুষ্টি

সময়ের প্রাচীন
    এবং কুৎসিৎ পাত্রে
মানুষ ভেঙে ফেলেছে 'যাদুচক্র'
এখন আমরা পাখির থেকেও দ্রুত
            উড়তে পারি
তবুও জীবন নিষ্ঠুর

জীবন ক্ষমাহীন
আমাদের ডানাগুলিকে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধে
শ্বাসরুদ্ধ করে আমাদের

বিষে এবং হতাশায়
আমাদের সমস্ত উৎসুখ স্বপ্নগুলিকে
চূর্ণ করে আকাশের শিরস্ত্রাণ দ্বারা
আর নীচে, মানুষের সমুদ্র
স্ফীত হয় অস্পষ্টভাবে, আশঙ্কাজনক

ভ্রাতৃত্বের আর আদৌ কোন আশা নেই
ভবিষ্যৎ একটা ইটের দেয়াল

বৃদ্ধ মানববিদ্বেষী জোঁকের মত জীবনের
যেন কেবলমাত্র একটিই সমাধান—যুদ্ধ, যুদ্ধ

লক্ষ লক্ষ মানুষের কী হবে যারা ক্ষুধার্ত?
যুদ্ধ!
কী দরকার সমস্ত অপ্রয়োজনীয় মৃত্যুর?
এই পৃথিবী কাঁপানো তরুণদের উন্মত্ত উচ্চাকাঙ্খার
কী হবে?

বর্বরতা এবং দুঃখপূর্ণ আমাদের সময়
এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত ধ্বংসের দিকে

ভবিষ্যতের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে
একটি ইস্পাত আবেগঘন যুগ

ঘটনাপঞ্জি

ওরা ক্রাপস-এ তৈরী করছে গ্রেনেড। আমরা ধারণা করছি
ওগুলির লক্ষ্য আমাদের দিকে। তাই তোমরা সেরা চেষ্টা করো
ওরা আগামীকালের যুদ্ধে আমাদের রক্ত ঝরাবে
আমরা লক্ষ লক্ষ। তাই ওদের শক্ত করে ধরো

বেয়ারস-এ ওরা আবিষ্কার করেছে এক নতুন ধরনের গ্যাস
ওরা বলে যে এটি আমাদের জন্য তৈরী করা
এটা পরিষ্কার যে এটি আমাদের ঝুলকালি মাখা বুক
জ্বালিয়ে দেবার জন্য। বাকিটা কিন্তু তুমি কল্পনা করতে পারো

নতুন ভাইকারস-এর মেশিনগান প্রতি সেকেন্ডে
দশজন মানুষকে হত্যা করতে সক্ষম
সবকিছু শুধুমাত্র আমাদের দৃঢ় মাথাকে উড়িয়ে দেবার জন্য
তাই চিন্তা করো না, সুখী হও। যতটা খারাপ পারো করো

খুশি হও যখন তুমি পারো, তুমি বানচাল করতে
পারবে না সেই কালো ঝড়কে যা
নেমে আসছে আমাদের উপর
তাই তোমার অস্ত্র দেখাও, তোমার খেলনাগুলি নিয়ে খেলো!
আমাদের যুগকে কুর্নিশ জানাও, কিন্তু এত বেশি গোলমাল করো না।

অনুবাদ : জিৎ পাল

একটি স্বপ্ন

'লোরি, তুমি কি ঘুমোলে? নাকি শুনছো?' 'চুপ,
মাথাটা রাখো নিচু' 'কিন্তু...,' 'বলি যা তা ফ্যালো করে
চুপ থাকো, নইলে শুনবে ওরা, শত্রুরা
রয়েছে যারা পাথর ছোড়ার দূরে'

'কিন্তু লোরি, আমি যে দেখেছি সুন্দরতম স্বপ্ন,
দেখেছি আমরা অস্ত্র নামিয়ে রেখেছি
যুদ্ধ হয়েছে শেষ, জিতেছি আমরা,
হ্যাঁ, স্বপ্নে আমরা জিতেছি

কারখানাতে ফিরে গেছি ফের কাজে
দাঁড়িয়েছি ফের পুরোনো লেদের মেশিনে
এখন যেন সে অনেক শক্তপোক্ত
ঝলসে উঠছে যেন সোনা, যেন আগুনে

এবং লোরি, তুমি তো ফোরম্যান, বললে
'তিনশত বোল্ট, হবে তো আজকে রাতে'
বলি, 'ঠিক আছে সমস্যা নেই বন্ধু'
বলেই আমরা উল্লাসে উঠি মেতে

বাইরে আকাশ, বিপুল আকাশ চাঁদোয়া
ঝকঝক করে, ঝকমক করে হাওয়া
বুকভরা হাওয়া টেনে নিতে পারি, বুঝেছি
এটা যে সত্যি তা কঠিন মেনে নেওয়া

তার চোখে চোখ রাখল তখন লোরি
রেগে গ্যাছে যেন, তবুও হাসল সে
'স্বপ্নভূক তুমি, ফার্নান্দেজ হে দোস্ত
শিশুর মতন স্বপ্ন দেখছ যে'

তারারা তখন মুছেই যাচ্ছে পূবে, আঁধার
তখন পিছিয়ে যাচ্ছে, ভয়ে বুক দুরুদুরু
কোথাও যেন বা বিউগিল ওঠে বেজে
চকিত হামলা ফের হয়ে গ্যালো শুরু।

বসন্ত

ও আমার বসন্ত, হে আমার শ্বেত বসন্ত
এখনও পাইনি সঙ্গ, এখনও ছায়া ছায়া
কেবল ধূসর স্বপ্নের ঘোরে দেখি
পপলার গাছে পিছলে সরে যাও
এখানে কিন্তু থামো না এতটুকু

হে আমার বসন্ত, ও আমার শ্বেত বসন্ত
মলয় বাতাসে ভর করে তুমি আসো

সাথে নিয়ে আসো ঝঞ্ঝা, আগুন, বৃষ্টি
আশায় রয়েছি আবার আসবে তুমি
ক্ষতগুলি সব আমূল ধুইয়ে দিতে

কী খুশিতে যেন পাখিরা গাইবে ফের
আকাশে উজানি সাঁতার দিতে দিতে
কী খুশিতে ফের আমরা ফিরবো কাজে
শ্রমে আর প্রেমে, বন্ধন গ্রন্থিতে

বসন্ত আমার, হে আমার শ্বেত বসন্ত
আমাকে তোমার উড়ান দেখতে দাও
মৃত বাগিচায় জীবন ফিরিয়ে দিয়ে
আমাকে তোমার সূর্যের সুতো দাও
মরে আসে যারা প্রাচীরের গায়ে গায়ে।

অনুবাদ : চন্দন ঘোষ

তখন অনেকটাই আমি থুত্থুরে

ঠিক তখন থুত্থুরে বয়স জড়িয়ে ধরবে আমায়
(যদি আমি কাটিয়ে উঠতে পারি জবাই, স্মৃতি)
বার্দ্ধক্য ততটাই যতটা পুরানো শিশু-পাঠ্যবই
পুরানো দিনের সবকিছু যার ঋতি

এবং ঠিক তেমনি যেমন শিশুরা পাতা ওলটায়
ছবি ছুঁয়ে ছুঁয়ে খুঁজে পেতে শেষের সেই সঞ্চিত শেষ
এমনি আজও টের পাই অবসর পেতে সাধ হয়
হে আমার বন্ধুজন কল্পনায় জড়িয়ে নিতে আগামীর রেশ

কেন নয়? কেউই স্বপ্নের ভিতর চালাতে পারেনা কাঁচি
উজ্জ্বল আগামী কাল থেকে থেকে জ্বলে উঠবে
বসে বসে দুঃখের বিলাস করা থেকে
অনেক শ্রেয়তর বাতাসের পেছনে দৌড়োনো।

কবিতা রচনার অপ্রমিত সময়

না এটা কোনো কবিতা লেখার শুভ সময় নয়
কোনো ছন্দের মুখে ফুটে উঠবে না কোনো ঈপ্সিত ধ্বনি
কী ভাবে কবিতা স্পর্শ করতে পারে সমূহ হৃদয়
যা রয়ে গেছে কঠিন ধাতব বর্মের নীচে বলে জানি

তোমার কলম যখন কোনো প্রত্যয়ে ঝলসে ওঠে হঠাৎ
তখনো কী দোদুল ছন্দঃস্পন্দ না কী বিস্ফোরণের ঝাঁজে
আকাশ জ্বলে যায় যেমন কোনো ক্ষেপনাস্ত্রের মুখে
সমস্ত শহর জুড়ে শিস দিয়ে ঘোরে আগুনে প্রপাত

আপাত শান্তি নামে কিন্তু কোনো হিম সাদা পাতায়
যেখানে থাকার কথা ছিলো কোমল আতরমাখা শব্দ-মালা
সেখানে সেই রুগ্ন ফ্যাকাশে পাতায় উঁকি দেবে মৃত্যুচ্ছায়া
সাথে বেরিয়ে পড়বে একপাল শ্বাপদ ক্রূর হিংস্রতায়

তারা ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত ক্রমশ দূর-দূরান্তরে
তাদের ব্যাদিত হাঁ মুখের সামনে হন্তব্য জীব
এবং তুমি টের পাবে তোমার শব্দের কিনারে
কালির গন্ধ নেই কিন্তু তোমার রক্তে যেন ডুবে ছিল কলমের নিব

যত তীব্রই হোক তোমার প্রয়াস এখন সার্বিক অপচয়
না হে, এটা লেখার কোনো প্রশস্ত সময় নয়

অনুবাদ : স্বপন চক্রবর্তী

অবিচলচিত্তের গান

ঘুমন্ত রেলের হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়ে
উঠে আসছে আর্তনাদ।
রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হয়।

আমাদের অস্থিমজ্জার ভেতর এখন
যন্ত্রণা আর ক্লান্তির আশ্চর্য সহবাস।

কে যেন বললো: একটা বিষয় আমি আশা করিনি—
আমি বললাম: আমি করেছিলাম
এ দুনিয়া আমার কাছে কিছু আশা করে!

জীবনের এই মহাপ্রান্তরে
কোথায় আমার অবস্থান
আমি জানি
আর তাই সহজেই আমি
মাথা নোয়াবো না।

একজন সৎ শ্রমিকের মতোই
স্বাধীনতা আর রুটির জন্য
লড়াই করতে করতেই একদিন
মৃত্যুর মুখোমুখি হবো।

বিশ্বাস

এইতো এখানে আমি,
দেখো,
বেঁচে আছি
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি
দিনের কাজকর্ম সারছি
নিজের মতো করে
কবিতা লিখছি।
জীবন আর আমি

গোমড়ামুখে একে অপরকে দেখে নিচ্ছি
দেখে নিচ্ছি একটা একটা করে মানুষকে
আর জারি রাখছি
আমার লড়াই

জীবনের সাথেই আমার দ্বন্দ্ব অহর্নিশ
তবে যেন মনে করো না
জীবনের প্রতি
আমার কোনো অনুরাগ নেই।
বরং উল্টোটাই।
যদি আমাকে মরতেই হয়
জীবনের প্রতি আমার অমোঘ ভালোবাসার
এই জীবনের প্রতি আমার অমোঘ ভালোবাসার
অনুভূতির কম্পমান
অনুরণন শুনতে শুনতে তার
ইস্পাতের থাবায়
পা রেখেই মরে যাবো

যদি তারা আমার গলায়
ফাঁসির দড়ি পরিয়ে জিজ্ঞেস করে
আমি বাঁচতে চাই কি না
আমি চিৎকার করে বলবো
খুলে দাও আমার ফাঁসির দড়ি,
যাও, দূর হও এখান থেকে
আহাম্মকের দল
হে জীবন
তোমার জন্য আমি কী-ই না করতে পারি
জানো না
তোমার জন্য আমি কতটা সাহসী হতে পারি
ইচ্ছে করে বিমানে উঠে
টর্পেডোর মতো একাকী
দুঃসাহসী অভিযাত্রী হয়ে
মহাকাশের গভীর প্রদেশে
আর অজানা গ্রহে ঢুঁ মেরে আমি

মাথার উপর নীল আকাশের
অপার আর বিরল সৌন্দর্য দেখতে
আজও আবার শিহরণ জাগে
আর এজন্যই আমার ইচ্ছে হয় বেঁচে থাকতে
আর এজন্যই আমি এখানে বেঁচে থাকতে চাই

যদি তুমি আমার বিশ্বাসের
একটা দানা-শস্য অপহরণ করো
বুকে আঘাত-পাওয়া
চিতাবাঘের মতো আমি যন্ত্রণায়
গর্জন করে উঠবো

বিশ্বাসই যদি চলে যায়
তাহলে কী-ই বা আমার আর থাকবে?
বিশ্বাস চুরি হয়ে গেলে
আমি আর বাঁচবো না
সত্যি কথা বলতে
বিশ্বাস চুরি গেলে
আমি আর বাঁচবো না

আমার বিশ্বাস
আগামী দিনগুলোকে করে তুলবে সুন্দর
জীবনকে করে তুলবে সুন্দর, মহান।
তুমি আমার ভবিষ্যতের
বিশ্বাসকে ভেঙে দিতে চাও?
কীভাবে তুমি তা করবে?
তোমার অস্ত্র কি বুলেট?
আর কোনো অস্ত্র নেই?
তাহলে নিরস্ত্র হও

বর্মে আচ্ছাদিত আমার বুকে
তোমার বুলেট এসে
মাথা কুটবে ব্যর্থতায়
তার শক্তি অবসিত হবে
তার শক্তি অবসিত হবে

অনুবাদ : অশোক চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাস

আমাদের কী দেবে তুমি, ইতিহাস,
তোমার পৃষ্ঠায়—বিবর্ণ-মলিন,
আমরা এসেছি অফিস-কারখানা থেকে—
যুগযুগান্তর হতে নামগোত্রহীন।

আমরা কৃষক, তীব্র দুর্গন্ধ-ছড়ানো
বাসি পিঁয়াজ আর রুটি,
পাগলের মতো দাড়িছেঁড়া ক্রোধে আমরা গাল দিই
সেই অভিশাপকে, যা আমাদের জীবনের রুজি।

তোমাদের উচিত অন্তত কৃতজ্ঞ থাকা
যেহেতু আমরা খুবই ভালভাবে যত্ন নিয়েছি তোমাদের
তাই পরাজিতদের মাংসে সারতে পারছ ভোজন—
রক্তপান করতে পারছ সহস্রের।

তুমি ধরতে পারবে শুধু বাইরের সীমারেখা
ভিতরের জীবন সম্পর্কে কিছুই জানো না,
যদি না কেউ ফাঁস করে দেয়
সাদামাটা জীবননাট্যের বহমান বঞ্চনা।

কোনো সন্দেহ নেই কবিরা ব্যস্ত হয়ে পড়বেন
তাঁদের পুস্তিকা আর প্রেমের আভাসে,

এবং আমাদের অলিখিত দুর্দশা
ভেসে বেড়াবে শূন্য বাতাসে।

আমাদের গল্প কি বলার মতো নয়?
হয়তো সবচেয়ে ভালো হবে ভুলে যাওয়া,
যদি স্পর্শ করো, দুর্গন্ধ ছড়াবে—
আমরা পচা, বিষাক্ত করি হাওয়া।

আমরা জন্মেছিলাম শস্যক্ষেতের ধারে
বেড়া-দেয়া কাঁটা ফণিমনসার ঝোপে,
আমাদের মায়েরা সেখানে শায়িত, শক্ত হিমায়িত—
ঠোঁট কামড়ে পড়ে ছিলেন হিম-ভোরের কোপে।

আমরা শরতের মাছির মতো লুপ্ত হয়ে যাই—
প্রতি বছরের 'সকল আত্মার দিবসে' *
মেয়েরা তাঁদের কান্নাকে পরিণত করেন প্রার্থনা-সঙ্গীতে
যা শুধু আগাছারা শোনে; বিরলে, বিবশে।

আমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে
তারা আমাদের কাজগুলো করবে,
দিনরাত্রি পরিশ্রম করবে—
যতক্ষণ না তাদের ঘাম দিয়ে রক্ত ঝরবে।

বাড়িতে আমাদের পিতারা বলবেন—
'তোমরা ভাগ্যের সাথে তর্ক করতে যেওনা।'
কিন্তু আমরা তাঁদের বোকা বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করি,
বলি, 'শুধু দেখে যাও আমরা পারি কিনা।'

আমরা ডিনারের টেবিল থেকে উঠে
সারারাত তর্ক করি নিজেরা নিজেদেরই সাথে।
সেখনে স্নিগ্ধ একটি আশা আমাদের স্পর্শ করে
সুন্দর আলোভরা হাতে।

আহা, কেমন উদ্বিগ্ন হয়ে আমরা অপেক্ষা করি—
রাস্তার ভিড়ে কিংবা কাফেগুলিতে।
বেতারের শেষ ঘোষণাগুলির পরে
আমরা রাতের বিছানায় যাই শুতে।

আহ্! যখন বেদনায় ভারী হয়ে ঝুলে থাকে আকাশ
তখনও কেমন দোলা দিতে থাকে আশার তড়িৎ—
ততক্ষণ, যতক্ষণ না শিস দেওয়া বাতাস
তপ্ত হয়ে, হয়ে ওঠে সহ্যের অতীত।

কিন্তু তোমার বাঁধানো অজস্র খণ্ডগুলিতে
আমাদের কষ্টভোগের সম্ভাব্য বর্ণনার বাঁকে বাঁকে
যন্ত্রণার আর্তনাদ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে—
চিৎকার রয়ে যাবে প্রতিটি শব্দের ফাঁকে ফাঁকে।

কেননা জীবন তার নির্মম ও ভারী নখরগুলি দিয়ে
আমাদের উপরে করেই চলেছে অত্যাচার—
একেবারে আমাদের ক্ষুধার্ত মুখগুলির উপর দিয়েই।
তাই, আমাদের জিহ্বা মানে না কোনো শিষ্টাচার।

এবং এই হলো কারণ যার জন্যে
দিনের শুরুতে আমরা লিখি যে কবিতা
সে যেমন ভারাক্রান্ত তেমনই ক্ষীণ—
সৌরভ ও ঔজ্জ্বল্যহীন সবই তা।

আমাদের যন্ত্রণার জন্যে তোমার পৃষ্ঠাগুলিতে স্থান পেয়ে
আমরা চাই না পুরস্কৃত হতে।
আমাদের সাজিয়ো না কোনা গতানুগতিক ছকে—
অথবা মেকি করুণার প্রলেপ দিওনা যুগযুগান্তের ক্ষতে।

যারা আসবে আগামীতে তাদের জন্যে
সহজ এক ছোট্ট বার্তা রেখে যাই ঃ
ভবিষ্যতের মানুষদের শুধু বলো
কী ভীষণ দুঃসাহসী ছিলো আমাদের লড়াই!

অনুবাদ : অমিত চক্রবর্তী

* সকল আত্মার দিবস **('All Souls 'Day')**–প্রতি বছরের নভেম্বর মাসের ২ তারিখ, যেদিন মৃতদের আত্মার মুক্তির জন্যে প্রার্থনা করা হয়।

নিকোলা ভাপৎসারভ-এর জন্ম ৭ ডিসেম্বর ১৯০৯ বান্সকো, বুলগেরিয়া। মৃত্যু : ২৩ জুলাই ১৯৪২ সোফিয়া, বুলগেরিয়া। 'উল্টোদূরবীন'-এর প্রচ্ছদে যে ছবিটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি বুলগেরিয় পুলিশের তোলা ফটোগ্রাফ ১৯৪২ সালে তাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এখানে ২০০৭ সালে প্রকাশিত গিয়োর্গী গসপডিনভ সম্পাদিত কিনো (KINO) সংকলন থেকে অধিকাংশ কবিতা নেওয়া হয়েছে। বিশেষত্ব কেননা অধিকাংশ ইংরাজী সংকলনে উপেক্ষিত কবিতাগুলোই KINOতে রয়েছে। যেমন 'একজন অন্ধমানুষ (A Blind man) তখন অনেকটাই আমি থুথুরে (By then I will be very old) এক মৎসজীবীর জীবন (A fisher man's life) একটি কাহিনী (Country cnonicle) ইত্যাদি। পিটার টেমপেস্ট ১৯৫২ সালে প্রথম তার কবিতার ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মুলত ১৯৫৩ সালে তার কবিতা সাড়া জাগায় ল্যাতিন আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়াতে। সে সময় তার কবিতা অনুবাদ করতে এগিয়ে আসেন ইয়ানিস রিটসস্, সালভাদোর কোয়াসিমাদো, নজিম হিকমত, নিকোলাস গিলেন, ভেসনা পার্ন। প্রাচ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সরোজ দত্তরাও একই লক্ষে সামিল হন। ভাপৎসারভ মরোনোত্তর 'বিশ্ব শান্তি পুরষ্কার' এ ভূষিত হন। এই সংখ্যার অধিকাংশ কবিতাই ইতিপূর্বে বাংলায় অনুদিত হয়নি। তাছাড়া ফ্রি ভার্সে না গিয়ে মূল থেকে ইংরাজীতে যে ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা বজায় রেখেই বাংলাতে অনুবাদ করার চেষ্টা হয়েছে। আমরা জানি কবির মনে যে বোধ, অনুভূতি ও দার্শনিকতার জন্ম নেয়, অনুবাদককে সেই কবির দেশকাল, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, লোকাচার এবং কবির তখনকার মানষিক অবস্থাকে আত্মস্থ করেই এগুতে হয় তবুও যথার্থ হয়না। ইংরাজী অনুবাদে বিশেষ করে, ৮০ দশকে সংস্কারের মধ্যে দিয়ে নতুনভাবে পারিগ্রহণ করা হয়েছে, তেমনি বাংলাতেও সেই প্রচেষ্টা হল বলা হয়তো অসমীচীন নয়। —সম্পাদক : উল্টো দূরবীন

ভার্নাতে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মকালে তোলা ভাপৎসারভের দুটি ছবি (১৯২৬-১৯৩২)

ভাপৎসারভ-এর বাড়ি (বর্তমানে ভাপৎসারভ মিউজিয়াম)

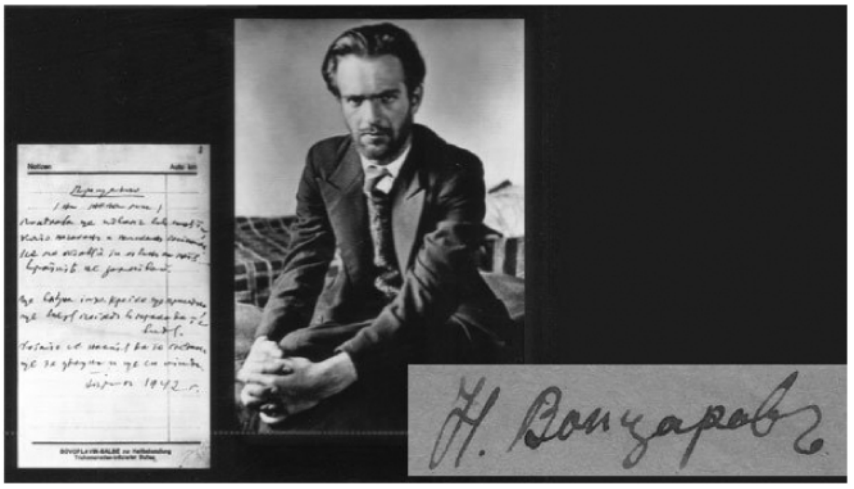

ভাপৎসারভের স্বাক্ষর ও হস্তলিপি সম্বলিত পিকচার কার্ড

নিকোলা, তোমাকে

রুপোর টাকা, প্রপিতামহের স্মৃতি
পড়ে ছিল পুরনো সিন্দুকে।

কালেভদ্রে
নাতিপুতি ছুঁয়েছে শীতল নীল উজ্জ্বলতা
চোখ বড়ো বড়ো করে।

বাজারে এনেছি।

বেনে ভাই, আগুনে গালাও
মাপো।

বেশিটা নগদে নেব, আর
এক কুচি
নাকচাবি হয়ে
বিঁধে থাক নাতনির নাকে ঝলমল!

স্বপন হালদার

সম্পাদক ঃ অমিত চক্রবর্তী স্বপন হালদার
Contact : G-6, Rabindra Palli, Block-A, 3rd Floor, Swapnalaya Apartment. Baguiati (Jora Mandir), Kolkata 700 059
Website : ultodrubin.wordpress.com ☐ Email :ultodurbin@gmail.com ☐ Phone : 9836587612 (M)
Published by Radha Chakraborty from the above address & printed by her from Cameo Pvt. Ltd, 140 Arabinda Sarani, Kol-6